হুমায়ূন আহমেদ
হলুদ
হিমু
কালো
র‍্যাব

গল্প শুরু করছি।

শুরুতেই আমার অবস্থানটা বলে নেই। আমি রাজমণি ঈশা খাঁ হোটেলের সামনের ফুটপাতে বসে আছি। সময় সন্ধ্যা। হাতে ঘড়ি নেই বলে নিখুঁত সময় বলতে পারছি না। রাস্তার হলুদ বাতি জ্বলে উঠেছে। আকাশে এখনো নীল নীল আলো। আমার কোলে একটা বই। বইটার নাম 'চেঙ্গিস খান'। লেখকের নাম ভাসিলি ইয়ান। আমার হাতে প্লাস্টিক কাপে এককাপ কফি। আয়েশ করে খাচ্ছি। হকাররা আজকাল ফুটপাতে চা-কফি বিক্রি করে। সেই কফি যে এতটা সুস্বাদু হয় জানা ছিল না।

কফি বিক্রেতা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স নয়-দশ হবে। সরল সরল চেহারা। বড় বড় চোখ। সাইজে অনেক বড় একটা হাফপ্যান্ট পরেছে। সেই প্যান্টের ঘেরও নিশ্চয়ই বড়। বার বার পেছনে নেমে যাচ্ছে। এই ছেলে একহাতে প্যান্ট ধরে আছে। ফুটপাতের ফেরিওয়ালাদের চোখে মায়া ব্যাপারটা থাকে না। এর চোখে আছে। সে যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে আমার কফি খাওয়া দেখছে। তার প্রধান কারণ অবশ্যি কফির দাম দেয়া হয় নি। কফির দাম পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকা আমার সঙ্গে নেই। দাম কীভাবে দেব তা নিয়ে আমি সামান্য দুশ্চিন্তায় আছি।

আমি কফির কাপে চুমুক দিয়ে আন্তরিক গলায় বললাম, তোর নাম কী?

সে কঠিন গলায় বলল, নাম দিয়া কী হইব? টেকা দেন। যাইগা।

আমি আহত গলায় বললাম, নাম বলবি না? চিন পরিচয় হবে না? আমার নাম হিমু। এখন তুই বল তোর নাম কী?

বজলু।

বাহ্ সুন্দর নাম। শুধু বজলু, না বজলু মিয়া?

বজলু মিয়া। টেকা দেন।

তুই দড়ি টড়ি দিয়ে প্যান্টটা শক্ত করে বাঁধবি না? কফি বিক্রি করছিস, হঠাৎ প্যান্ট নেমে গেল। কেলেংকারি ব্যাপার হবে না?

টেকা দেন।

আমি কফির কাপ রাস্তায় ছুড়ে ফেলতে ফেলতে বললাম, টাকা নাই।

কফি খাইছেন টেকা দিবেন না?

কোত্থেকে দিব? টাকা নাই বললাম না? তুই কি কানে কম শুনস?

আপনি কি ভাবছেন আমি আপনেরে ছাইড়া দিমু? আমারে আপনে চিনেন নাই।

কী করবি? মারবি?

টেকা দেন কইলাম। এক্ষণ দিবেন। না দিলে আপনের খবর আছে।

তুই কি মাস্তান না-কি? প্যান্ট ঢিলা মাস্তান?

কথাবার্তার এই পর্যায়ে ঈশা খাঁ হোটেলের গোঁফওয়ালা দারোয়ানকে আসতে দেখা গেল। আমি তার দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় বললাম, এই যে দারোয়ান ভাই! দেখেন তো, এই পিচকি চাওয়ালা বিরাট যন্ত্রণা করছে। আমি চা-কফি কিছুই খাই নাই। বলে কি কফির দাম দেন।

দারোয়ান নিমিষেই বজলু মিয়ার ঘাড় চেপে ধরে বলল, এই বয়সেই বদমাইশি শিখছস। চোরের বাচ্চা।

বজলু মিয়া কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এই লোক কফি খাইছে।

আমি বললাম, কফি খেলে আমার হাতে কাপ থাকবে না? কাপ কইরে ব্যাটা?

দারোয়ান বলল, এইগুলা বদমাইশের চূড়ান্ত।

আমি বললাম, হালকা একটা থাপ্পড় দিয়ে ছেড়ে দেন।

দারোয়ান বলল, ছাড়াছাড়ি নাই। এর কফি বেচাই বন্ধ। স্যার, এই বিচ্ছুর দল কী করে শুনেন— হোটেলের গেস্ট পার্কিং-এ ঢোকে। গেস্টদের গাড়ির পাম ছেড়ে দেয়। আমার চাকরি যাওয়ার অবস্থা।

আমি বললাম, এই ছেলে মনে হয় পাম ছাড়ে না। কী রে বজলু, তুই পাম ছাড়িস?

বজলু না-সূচক মাথা নাড়ল। তার চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে। জগৎ সংসারের নির্মমতায় সে নিশ্চয়ই হতভম্ব। ইতিমধ্যেই দারোয়ানের একটা কঠিন চড় সে খেয়েছে। চড়ের দাগ গালে বসে গেছে। এই দারোয়ানের চেহারা কুস্তিগিরের মতো। গাবদা গাবদা হাত।

আমি মীমাংসা করে দেবার মতো করে বললাম, বজলু, এক কাজ কর। তুই দারোয়ান ভাইকে ভালো করে এককাপ কফি খাওয়া। তোকে মাফ করা হলো। ভবিষ্যতে এরকম করবি না।

বজলু মিয়া চোখ মুছতে মুছতে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। কফি বানিয়ে দারোয়ানের হাতে এককাপ কফি দিয়ে হঠাৎ রাস্তা পার হয়ে দৌড় দিল। চা-কফির ফ্লাস্ক রেখেই দৌড়। ব্যাপারটার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। দারোয়ান বলল, বদমাইশটা ভয় পাইছে। জিনিসপত্র ফালায়া দৌড়। মনে পাপ আছে বইল্যাই ভয় খাইছে। যার মনে পাপ নাই তার মনে ভয়ও নাই।

আমি দু'টা ফ্লাস্ক এবং বালতি নিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে রওনা হলাম। ফ্লাস্ক দু'টার সঙ্গে বালতি কেন আছে বোঝা যাচ্ছে না। তাও খালি বালতি না। বালতিতে পানি আছে।

সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে সারাদিনই তরুণ-তরুণীদের প্রেম প্রেম খেলা চলে। সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে তারা ঘরে ফিরে। এই সময় তাদের দরকার গরম চা এবং গরম কফি— One for the road.

আমি ফ্লাস্ক নিয়ে ঘুরছি এবং গম্ভীর গলায় বলছি— গ্রম চা, গ্রম কফি। ভালোই বিক্রি হচ্ছে। ডিমান্ড বেশি দেখে আমি দামও বাড়িয়ে দিয়েছি। চা পাঁচ টাকা, কফি দশ টাকা।

কে? হিমু না? আই হিমু।

আমি ঘুরে তাকালাম। বড় খালু সাহেব। তাঁর পরনে ট্রেক স্যুট। কেডস জুতা। কাঁধে হাফ টাওয়েল। তিনি ডায়াবেটিস কমানোর দৌড় দিচ্ছেন। মুখে ঘাম জমলেই টাওয়েলে মুখ মুছছেন।

হিমু, তুমি করছো কী?

গ্রম চা, গ্রম কফি বিক্রি করছি।

খালু সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, সে-কী!

আমি হাসিমুখে বললাম, স্বাধীন ব্যবসায় নেমে পড়লাম। খাবেন এক কাপ?

তুমি কি সত্যি চা-কফি বিক্রি করছো?

হুঁ।

তোমার পক্ষে অসম্ভব কিছু না। সবই সম্ভব। চায়ে চিনি দেয়া?

হুঁ।

চিনি কি বেশি?

প্রিপেয়ারড স্ট্যান্ডার্ড চা-কফি। সবই পরিমাণ মতো। পছন্দ না হলে মূল্য ফেরত।

দাম কত?

চা পাঁচ, কফি দশ।

এত দাম দিয়ে চা কফি কে খাবে?

সবাই তো খাচ্ছে।

খালু সাহেব বেঞ্চের দিকে এগুতে এগুতে বললেন, দে এক কাপ চা খাই। তোমাকে এখানে চা বিক্রি করতে দেখব এটা আমার Wildest ইমাজিনেশনেও ছিল না।

দেখে মজা পেয়েছেন?

হুঁ। তোমার চা তো ভালো।

থ্যাংক য়্যু।

তোমার খালাকে এই ঘটনা বললে সে বিশ্বাস করবে না।

বিশ্বাস না করারই কথা।

তোমার কাছে কি সিগারেট আছে? সিগারেট ছাড়া চা খেয়ে কোনো মজা নাই।

সিগারেট নেই। এনে দেই?

দাও এনে দাও। চা কফি যখন বিক্রি করছো সঙ্গে সিগারেটও রাখবে।

বুদ্ধি খারাপ না।

সিগারেট কি একটা আনব, না এক প্যাকেট?

একটা। বাড়িতে সিগারেট খাওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ। সিগারেট ধরালে তোমার খালা মাতারিদের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করে। যতই বয়স বাড়ছে এই মহিলা ততই অসহ্য হয়ে উঠছে।

খালু সাহেব বিরক্ত হয়ে থুথু ফেললেন। আমি গেলাম সিগারেটের খোঁজে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ আগেই মিলিয়েছে। তবে আকাশে এখনো আলো আছে। চারদিক অন্ধকার। খালু সাহেব আরাম করে তৃতীয় কাপ চা এবং দ্বিতীয় সিগারেট খাচ্ছেন। তাঁকে আনন্দিতই মনে হচ্ছে। আমরা বসে আছি পার্কের বেঞ্চে।

হিমু, তোমার চায়ে মিষ্টি বেশি হলেও চা ভালো।

থ্যাংক য়্যু।

তোমাকে একটা কথা বলা দরকার, তোমার সঙ্গে যে আমার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেখা হয়েছে এটা যেন তোমার খালা না জানে।

জানলে কী?

আছে, সমস্যা আছে। যখনই শুনবে আমি এই জায়গায়, তোমার খালার মাথায় রক্ত উঠে যাবে।

কেন?

মহিলার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে গেছে। চূড়ান্ত সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত একজন মহিলা। আমার মতো বয়সের একজন পুরুষকে সন্দেহ করার কী আছে তুমি বলো? আমার মতো বয়সের একটা পুরুষ এবং নিউমার্কেট কাঁচাবাজারের ভেজিটেবলের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

খালা তো জানে আপনি এইখানে জগিং করতে আসেন।

খালু সাহেব বড় করে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, জানে না। আমি তাকে বলেছি আমি ধানমণ্ডি লেকের চারপাশে ঘুরাঘুরি করি।

আমি বললাম, খালু সাহেব, আপনি আরেক কাপ চা খান। আরেকটা সিগারেট ধরান। তারপর ঝেড়ে কাশেন। খুকখুক কাশিতে হবে না। ঝেড়ে কাশতে হবে।

খালু সাহেব পুরোপুরি ঝেড়ে কাশলেন না। যা বললেন, তার সারমর্ম হলো— তিনি একদিন বেকুবের মতো তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, সন্ধ্যার পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রস্টিটিউটদের আনাগোনা শুরু হয়। এদের মধ্যে একটা মেয়ে আছে সুন্দর, মায়াকাড়া চেহারা। তার নাম আবার ইংরেজি— ফ্লাওয়ার। খালা এই শুনেই ক্ষেপে অস্থির— ঐ মেয়ের নাম তুমি জানলে কীভাবে? খালু সাহেব বললেন, দূর থেকে শুনেছি ফ্লাওয়ার নামে অনেকেই ডাকছে। খালা বললেন, তুমি গেছ দৌড়াতে, তোমার এত শোনাশুনি কী? আর কখনো ঐ জায়গায় যাবে না। যদি শুনি তুমি গিয়েছ তাহলে ঠ্যাং ভেঙে দেব। দৌড়াদৌড়ি জন্মের মতো শেষ।

আমি বললাম, আপনি তারপরেও নিয়মিত এই জায়গায় আসছেন?

খালু সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তুমিও দেখি তোমার খালার মতো সন্দেহপ্রবণ। রোজ আসব কেন? মাঝে মধ্যে ভেরিয়েশনের প্রয়োজন হয়। একই জায়গায় রোজ ঘুরতে ভালো লাগে? তুমি ত্রিশদিন দুইবেলা ইলিশ মাছ খেতে পারবে?

ফ্লাওয়ারের সঙ্গে আজ কি দেখা হয়েছে?

না।

গতকাল দেখা হয়েছিল?

এই আলাপটা বন্ধ রাখা যায় না? তোমাকে বলাটাই ভুল হয়েছে।

খালু সাহেব উঠে পড়লেন। আমি থেকে গেলাম। বজলু মিয়া কোথায় থাকে কী সমাচার খুঁজে বের করতে হবে। চাওয়ালাদের জিজ্ঞেস করতে হবে। ঠিকানা খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে না, আবার সহজও হবে না। মিস ফ্লাওয়ারের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। দেখা যদি হয় এককাপ ফ্রি কফি।

বজলু মিয়ার সন্ধান পাওয়া গেল না, তবে মিস ফ্লাওয়ারের সন্ধান পাওয়া গেল। সে থাকে কাওরানবাজারে বস্তিতে। মাছের আড়তের পেছনে। কাঁঠালগাছের গাছের সঙ্গে লাগোয়া চালা। খুঁজে বের করা না-কি খুবই সহজ।

রাত এগারোটার দিকে মেসে ফেরার পথে র‍্যাবের হাতে পড়ে গেলাম। বেঁটে খাটো একজন আমার দিকে এগিয়ে এলো। তার মাথায় কালো ফেট্টি নেই। চোখে চশমা। চশমা পরা র‍্যাব প্রথম দেখছি। র‍্যাবদের চোখ ভালো। কেউ চশমা পরে না। তারা খালি চোখেই অনেক দূর দেখতে পারে।

তোমার নাম?

স্যার, আমার নাম হিমু।

তুমি কী কর?

ফেরিওয়ালা। চা-কফি ফেরি করি।

ফ্লাস্কে কী?

একটা ফ্লাস্ক খালি। অন্য ফ্লাস্কে অল্প কিছু কফি আছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা কফি খাবেন স্যার? হাফ প্রাইস।

ফ্লাস্ক খুলে ফ্লাস্কের ভেতর কী আছে দেখাও।

আমি দেখালাম। ফ্লাস্ক উপুড় করতে হলো। কফির ফ্লাস্ক উপুড় করতেই কফি পড়ে গেল।

বালতিতে কী?

পানি।

দেখাও।

পানিও দেখালাম।

তোমার বগলে কী?

একটা বই স্যার।

কী বই?

জঙ্গি বই স্যার। বিরাট বড় এক জঙ্গির জীবনকথা। জঙ্গির নাম চেঙ্গিস খান। নাম শুনেছেন কি-না জানি না।

দেখি বইটা।

র‍্যাবের এই লোক (কথাবার্তায় মনে হচ্ছে অফিসার) বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।

বইটা কার?

আমার মামাতো বোনের মেয়ের। মেয়ের নাম মিতু। ভিকারুননেসা স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে। ছাত্রী খারাপ না। স্যার, আমি কি এখন যেতে পারি?

না। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।

আমি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, ক্রসফায়ার হবে?

অফিসার জবাব দিলেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই র‍্যাবের এক গাড়িতে আমি চড়ে বসলাম। গাড়ি প্রায় উড়ে চলেছে। এয়ারপোর্ট রোড ধরে যাচ্ছি। যানবাহন কম। র‍্যাবের গাড়ি দেখেই মনে হয় অন্যরা পথ করে দিচ্ছে। পোঁ পোঁ শব্দের অ্যাম্বুলেন্সকেও কেউ এত দ্রুত পথ ছাড়ে না।

র‍্যাবের অফিসার ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছেন। এখন তাঁর চোখে কালো চশমা। রাত ন'টায় কালো চশমা মানে অন্য জিনিস। আমি অফিসার স্যারের দিকে তাকিয়ে অতি আদরের সঙ্গে বললাম, স্যার, আমার চোখ বাঁধবেন না?

কেউ কোনো জবাব দিল না। পুলিশের সঙ্গে র‍্যাবের এইটাই মনে হয় তফাত। পুলিশ কথা বেশি বলে। র‍্যাব চুপচাপ। তারা কর্মবীর। কর্মে বিশ্বাসী।

আমার নতুন অবস্থান বর্ণনা করি। আমি হাতলবিহীন কাঠের চেয়ারে বসে আছি। নড়াচড়া করতে পারছি না। আমার হাত পেছনের দিকে বাঁধা। বজ্র আঁটুনি। ফস্কা গিরোর কোনো কারবারই নেই। টনটন ব্যথা শুরু হয়েছে। আমার সামনে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের মতো টেবিল। টেবিলের ওপাশে তিনজন বসে আছেন। মাঝখানে যিনি আছেন তাঁর হাতে চেঙ্গিস খান বই। তিনি অতি মনোযোগে বইটা দেখছেন। বইটার ভেতর সাংকেতিক কিছু আছে কিনা

ধরার চেষ্টা করছেন বলে মনে হচ্ছে। এক দুই লাইন করে মাঝে মধ্যে পড়েন এবং ভুরু কুঁচকে ফেলেন।

এই ভদ্রলোকের বাঁ পাশে যিনি আছেন তাঁর মুখ ঘামে চটচট করছে। মনে হচ্ছে এইমাত্র তিনি ক্রসফায়ারিং সেরে এলেন। ভদ্রলোকের নাম দেয়া গেল ঘামবাবু। তৃতীয় ব্যক্তির নাম ঘামবাবুর সঙ্গে মিল রেখে দিলাম হামবাবু। তাঁর মুখভর্তি হামের মতো দানা। মাঝখানের জনের নাম এই মুহূর্তে দিতে পারছি না। তাকে মধ্যমণি নামেই চালাবো।

হামবাবুর হাতে একটা টেলিফোন সেট। টেলিফোন সেটে হয়তো কিছু কারিগরি আছে। কারণ হামবাবু বেশ কিছু বোতাম টেপাটেপি করছেন। হামবাবু আমাকে আমার তিন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নাম এবং টেলিফোন নাম্বার দিতে বলেছেন। আমি শুধু বড় খালার নাম দিয়েছি। কারণ উনার টেলিফোন নাম্বারই আমার মনে আছে। অন্য কারোরটা নাই। মিতুর নাম্বারটা অবশ্যি দেয়া যেত। ওকে জন্মদিনে মোবাইল সেট দেয়া হয়েছে। নাম্বার আমার মনে আছে। ইচ্ছা করেই ওর নাম্বার দিলাম না। বাচ্চামেয়ে র‍্যাবের টেলিফোন পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে।

হামবাবু মনে হয় আমার দেয়া নাম্বার নিয়েই গুতাগুতি করছেন। এতক্ষণ কানেকশান পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন মনে হয় পাওয়া গেল। হামবাবুর মুখ উজ্জ্বল। তিনি ঘামবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, পাওয়া গেছে।

মধ্যমণি বাবু (এখনো বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন) বললেন, স্পিকার অন করে দাও, কথাবার্তা সবাই শুনুক।

স্পিকার অন করা হতেই আমি বড় খালার অতি বিরক্ত গলা শুনলাম— হ্যালো, হ্যালো কে?

আমি র‍্যাব অফিস থেকে বলছি। র‍্যাব। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান।

ও আচ্ছা! কী চান? (খালা খানিকটা দমে গেছেন। চাপা গলা।)

কিছু ইনফরমেশন চাই।

আমার কাছে আবার কী ইনফরমেশন? (খালার স্বর আরো ডাউন হয়ে গেছে। প্রায় কাঁদো কাঁদো।)

হিমু নামে কাউকে চেনেন?

সে কি র‍্যাবের হাতে ধরা পড়েছে?

সে কারো হাতেই ধরা পড়ে নি। তাকে চেনেন কি-না বলেন।

চিনব না কেন, আমি তার খালা। বড়খালা।

তার সঙ্গে আপনার শেষ দেখা কবে হয়েছে?

এক দেড় মাস আগে। তাকে আমি বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করেছি। নিষেধের পরে আর আসে নাই।

নিষেধ করেছেন কেন?

তার কাজকর্মের কোনো ঠিক নাই। তার বেতালা কাজকর্ম আমরা পছন্দ না।

কী বেতালা কাজকর্ম?

তার সব কাজকর্মই বেতালা।

সে কি বোমাবাজি সন্ত্রাসী এইসব কাজকর্মে যুক্ত?

যুক্ত যদি হয় আমি মোটেই আশ্চর্য হবো না। তাকে বিশ্বাস নাই। সে যে-কোনো কিছু করতে পারে।

তার পেশা কী?

সে শুধু হাঁটে। তার কোনো পেশাফেশা নাই।

ইদানীং কি সে ফেরিওয়ালার পেশা ধরেছে? চা-কফি বিক্রি করছে?

অসম্ভব। এইসব সে করবে না। সে কোনো কাজে থাকবে না। অকাজে থাকবে।

আমরা যতদূর জানি সে ইদানীং চা-কফি ফেরি করে।

যদি করে তাহলে বুঝতে হবে তার পিছনে তার কোনো না কোনো উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য ছাড়া সে কিছু করবে না।

খারাপ উদ্দেশ্য?

হতে পারে।

আপনাকে ধন্যবাদ।

হিমু গাধাটা আছে কোথায়?

হামবাবু এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। বিজয়ীর ভঙ্গিতে তিনি মধ্যমণি বাবুর দিকে তাকালেন। যেন এইমাত্র ট্রাফালগার স্কয়ার যুদ্ধে তিনি নেপোলিয়নকে পরাজিত করেছেন।

মধ্যমণি বাবু বই থেকে মুখ না তুলে বললেন, থানাগুলির কাছ থেকে ইনফরমেশন নাও। ওদের কাছে কোনো রেকর্ড আছে কি-না দেখ। রেকর্ড থাকার কথা।

স্পিকার কি অন থাকবে, না অফ করে দেব?

অন থাকুক, অসুবিধা নেই।

রমনা থানার ওসি সাহেবকে সবার আগে পাওয়া গেল। তিনি বললেন, হিমু আপনাদের হাতে ধরা পড়েছে। হিমালয়?

হিমালয় কি-না জানি না, নাম বলছে হিমু।

গায়ে হলুদ পাঞ্জাবি?

হুঁ।

খালি পা?

হ্যাঁ খালি পা।

ওকে ধরে রেখে কোনো লাভ নাই স্যার। ছেড়ে দেন। ফালতু জিনিস।

ফালতু জিনিস মানে কী?

উল্টাপাল্টা কথা বলে মাথা 'ইয়ে' করে দেবে।

মাথা 'ইয়ে' করে দেবে মানে কী?

মাথা আউলা করে দেবে।

র‍্যাবের মাথা আউলা করতে পারে এমন জিনিস বাংলাদেশে নাই।

অবশ্যই স্যার। অবশ্যই।

তার নামে থানায় কি কোনো রেকর্ড আছে?

তাকে অনেকবার থানায় ধরে আনা হয়েছে। কিন্তু তার নামে কোনো কেইস নাই। জিডি এন্ট্রিও নাই।

তার এগেইনস্টে কিছুই না থাকলে থানায় তাকে ধরে আনা হয়েছে কেন?

আপনারা যে কারণে ধরেছেন আমরাও সেই কারণে ধরেছি।

আমরা কী কারণে ধরেছি আপনি জানেন কীভাবে? স্টুপিডের মতো কথা বলবেন না।

সরি স্যার। মুখ ফসকে বলে ফেলেছি।

ধানমণ্ডি থানার ওসিকে অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া গেল না। তবে মোহাম্মদপুর থানার ওসিকে পাওয়া গেল। ওসি সাহেব বললেন— স্যার, ওকে ধমক ধামক দিয়ে ছেড়ে দেন।

মধ্যমণি বললেন, Why? ছেড়ে দিতে হবে কেন?

ওসি সাহেব বললেন, পাগল আটকিয়ে লাভ কী?

ঘামবাবু বললেন, সে পাগল?

ওসি সাহেব বললেন, ঠিক তাও না। একটু 'ইয়ে'।

হামবাবু বললেন, ইয়েটা কী?

কিছু না স্যার, এমনি বললাম। তবে...

তবে কী?

একটু চিন্তা করে বলি স্যার?

চিন্তা করতে কতক্ষণ লাগবে?

এই ধরেন আধঘণ্টা।

মধ্যমণি বললেন, আমি আপনাকে একঘণ্টা সময় দিলাম। একঘণ্টার মধ্যে তার সম্পর্কে ফুল রিপোর্ট চাই।

ইয়েস স্যার।

ঘড়ি ধরে একঘণ্টা।

টেলিফোন পর্ব শেষ হলো। মধ্যমণি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি টেলিফোন কনভারসেশন সবই শুনলেন। এখন আপনার বলার কিছু থাকলে বলুন।

আমি খানিকটা আহ্লাদ বোধ করলাম। এতক্ষণ তুমি তুমি করা হচ্ছিল, এখন আপনিতে প্রমোশন। ভাবভঙ্গি আশা উদ্রেক টাইপ। হয়তো হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হবে। রক্ত চলাচল বন্ধ হবার জোগাড়।

চুপ করে আছেন কেন? আপনার নিজের বিষয়ে কিছু বলার থাকলে বলুন।

নিজের বিষয়ে আমার কিছু বলার নাই স্যার। তবে আপনারা চাইলে আমি একটা ছড়া বলতে পারি।

ছড়া বলবেন? (হামবাবু হুঙ্কার দিলেন)

বলতে দাও! (মধ্যমণির ঠাণ্ডা মোলায়েম গলা)

আমি বেশ কায়দা করে ছড়া বললাম— আমার নাম হিমু। এখন আমি একটা ছড়া বলব। ছড়ার নাম 'র‍্যাব'।

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
র‍্যাব এলো দেশে
সন্ত্রাসীরা ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

ছড়াটার মানে কী?

এটা হলো স্যার ননসেন্স রাইম। ননসেন্স রাইমের মানে হয় না। হামটি ডামটি সেট অন এ ওয়ালের কি কোনো মানে হয়?

ঘামবাবু বললেন, ফাজলামি ধরনের কথা বলে র‌্যাবের হাত থেকে পার পাওয়া যায় না এটা জানো?

আমি বললাম, জানি স্যার। উপরে আছেন রব আর নিচে আছেন র‌্যাব।

এতক্ষণে হামবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি প্রায় বিদ্যুৎচমকের মতো উঠে এসে প্রচণ্ড এক চড় দিয়ে আমাকে ধরাশায়ী করতে গেলেন। সফল হলেন না, মেঝেতে পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। পতনের শব্দে ঘরবাড়ি দুলে উঠার মতো হলো। প্রচণ্ড ব্যথায় উনার চিৎকার চেঁচামেচি করার কথা। তিনি কিছুই করলেন না। ঘরে সুনসান নীরবতা। নীরবতা ভঙ্গ করে মধ্যমণি উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, কী ব্যাপার?

আমি বললাম, উনার স্ট্রোক হয়েছে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় এই কাজটা হয়েছে। উনাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। উনি কোমায় চলে গেছেন।

মধ্যমণি বললেন, তোমাকে অ্যাডভাইস দিতে হবে না। তোমাকে শায়েস্তা করা হবে। অপেক্ষা করো।

হামবাবুকে নিয়ে ছোটাছুটি শুরু হয়েছে। তার এক ফাঁকে মধ্যমণি কাকে যেন বললেন (আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে), এই বদমাশটাকে আটকে রাখ।

আমি বললাম, স্যার, রাতে কি ডিনার দেয়া হবে? রব ডিনারের ব্যবস্থা করেন। র‌্যাব করবে না?

মধ্যমণি এমন ভঙ্গিতে তাকালেন যার অর্থ— Wait and see!

অ্যাম্বুলেন্স চলে এসেছে। হামবাবুকে স্ট্রেচারে তোলা হচ্ছে। অফিসে বিরাট উত্তেজনা। অন্যের উত্তেজনা দেখতে ভালো লাগে। আমার ভালোই লাগছে।

কোথায় আছি কী ব্যাপার একটু বলে নেই। সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে তখন সেই জাহাজের অবস্থান ক্ষণে ক্ষণে চারদিকে জানিয়ে দিতে হয়। আমি এখন অনিশ্চয়তা নামক সমুদ্রে ভাসমান ডিঙ্গি। তবে নিরানন্দের মধ্যেই যেমন থাকে আনন্দ, অনিশ্চয়তার মধ্যেও থাকে নিশ্চয়তা।

আমাকে জানালাবিহীন একটি ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে গুদামঘর। এক কোনায় গাদা গাদা খালি কার্টুনের স্তূপ। কার্টুনের গায়ে লেখা— Expo Euro. তার পাশে মগের ছবি। অন্যপাশে টিনের বড় বড় কৌটা। রঙের কৌটা হতে পারে। একটা পুরনো আমলের খাট দেখতে পাচ্ছি। খুলে রাখা হয়েছে।

কার্টুনের স্তূপে হেলান দেয়ার মতো ভঙ্গি করে একজন হাঁটু মুড়ে বসে আছে। তার অবস্থা 'গুরুচরণ'। হাত-পা সবই বাঁধা। কপাল ফেটেছে। রক্ত চুইয়ে পড়ছিল। এখন রক্ত জমাট বেঁধে আছে। লোকটার মুখের কাছে একগাদা মশা ভনভন করছে। মশাদের কাণ্ডকারখানা বুঝতে পারছি না। লোকটার কপাল, থুতনি এবং গায়ে চাপ চাপ রক্ত। মশারা ইচ্ছা করলেই সেখান থেকে রক্ত খেতে পারে। তা না করে মশারা তাকে কামড়াচ্ছে।

লোকটা যেখানে বসে আছে সে জায়গাটা ভেজা। সেখান থেকে উৎকট গন্ধ আসছে। আমি বললাম, ভাইসাব কি এখানে পেসাব করেছেন?

লোকটি অবাক হয়ে তাকাল। যেন এমন অদ্ভুত প্রশ্ন সে তার জীবনে শোনে নি। আমি বললাম, আমরা একসঙ্গে আছি, আসুন আলাপ পরিচয় হোক। আমার নাম হিমু। আপনার নাম কী?

লোকটা খড়খড়ে গলায় বলল, এরা আমাকে মেরে ফেলবে। আজ রাতেই মারবে।

আপনি তো এখনো আপনার নাম বললেন না?

ছাদেক।

কোন ছাদেক ? মুরগি ছাদেক ?

হুঁ।

আরে ভাই আপনি তো বিখ্যাত মানুষ! শীর্ষ দশে আছেন। আপনার নামে তো পুরস্কারও আছে। আপনাকে ধরল কীভাবে ?

লাক খারাপ এইজন্যে ধরা খেয়েছি।

শুধু যে ধরা খেয়েছেন তা না। পেসাব পায়খানা করে ঘরের অবস্থা কাহিল করে ফেলেছেন।

মুরগি ছাদেক ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার কথাবার্তা মনে হয় তার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো মানুষই রসিকতা নিতে পারে না। মুরগি ছাদেকও পারছে না। সে চাপা গলায় বলল, আপনার পরিচয়টা বলেন।

আমি বললাম, একবার আপনাকে বলেছি। আমার নাম হিমু।

শুধু হিমু ?

কফি হিমু বলতে পারেন। কফি বিক্রি করি।

আপনাকে ধরেছে কেন ?

কফি বিক্রির জন্য ধরেছে। অপরাধ তেমন গুরুতর না, তবে অতি সামান্য অপরাধেও ক্রসফায়ারের বিধান আছে।

আপনাকে মারবে না।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কীভাবে বুঝলেন মারবে না ?

মুরগি ছাদেক বলল, আপনার চেহারায় মৃত্যুর ছায়া নাই। যারা মারা যায় তাদের মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়ে। আমি জানি।

আমি বললাম, আপনার জানার কথা। আপনি অনেক মানুষ মেরেছেন।

মুরগি ছাদেক চুপ করে রইল। আমি বললাম, সর্বমোট কয়জন মানুষ মেরেছেন ? বলতে চাইলে বলেন। না বলতে চাইলে নাই। অপরাধের কথা বললে পাপ কাটা যায়।

কে বলেছে ?

যেই বলুক ঘটনা সত্য। কয়টা মানুষ মেরেছেন বলুন তো ?

মুরগি ছাদেক বিড়বিড় করে বলল, নিজের হাতে বেশি মারি নাই। চাইর পাঁচজন হবে।

অন্যের হাতে আরো বেশি ?

হুঁ।

ভাই, আপনি তো ওস্তাদ লোক। কোনো পুলাপান মেরেছেন ?

মুরগি ছাদেক অস্ফুট গলায় কী যেন বিড়বিড় করল। শুনতে পেলাম না। আমি বললাম, ভাই সাহেব, কী বলছেন আওয়াজ দিয়ে বলেন, শুনতে পাচ্ছি না।

মুরগি ছাদেক বলল, আমি আজরাইল দেখেছি।

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, আজরাইল দেখেছেন ?

হুঁ।

চেহারা কেমন ?

মুরগি ছাদেক বিড়বিড় করে বলল, মুখ দেখি নাই। মুখ পর্দা দিয়ে ঢাকা।

বিরাট লম্বা ?

না। ছোট সাইজ। হাতও ছোট ছোট। আঙুল বড়।

আজরাইল কি একবারই দেখেছেন ?

দুইবার দেখেছি।

আজও মনে হয় দেখবেন। দানে দানে তিন দান। আপনাকে কি আজ রাতেই মারবে ?

মনে হয়।

ভয় লাগছে ?

না।

মরবার আগে কিছু খেতে ইচ্ছা করে ?

ইচ্ছা করলেই পাব কই ? আপনে আইনা দিবেন ?

চেষ্টা করে দেখতে পারি। বলুন কী খেতে চান ?

মুরগি ছাদেক হেসে ফেলল। আমার শরীর কেঁপে গেল। আমি আমার জীবনে এত কুৎসিত হাসি দেখি নি।

হিমু শুনেন। আমার সাথে আপনে অনেক বাইচলামি করেছেন। আমি মুরগি ছাদেক। আমার সাথে বাইচলামি চলে না। এখন 'অফ' যান।

ঠিক আছে 'অফ' গেলাম। আপনি অন হয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। কিছু মশা আমার দিকেও উড়ে এসেছে। আমি মুরগি ছাদেকের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে মশা তাড়িয়ে দিচ্ছি না। বরং পাথরের মূর্তির মতো বসে আছি। রক্ত নামক প্রোটিন স্ত্রী মশাদের জন্যে অতি প্রয়োজনীয়। এই প্রোটিন ছাড়া তারা তাদের গর্ভের ডিম বড় করতে পারে না।

আমি চুপ করে আছি। মশারা মহানন্দে রক্ত খেয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে উৎসবের উত্তেজনা। আমি একপর্যায়ে হা করে জিভ বের করে দিলাম। ছোট্ট একটা পরীক্ষা— মশারা জিভ থেকে রক্ত নেয় কি-না দেখা। মানুষের জিহ্বা তাদের জন্যে অপরিচিত ভুবন। মশারা কি অপরিচিত ভুবনে পা রাখবে? নামি মানুষই শুধু অপরিচিত ভুবনে পা রাখার সাহস দেখায়।

মুরগি ছাদেক একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে বিস্ময় এবং কৌতূহল। মানুষ বড়ই অদ্ভুত প্রাণী। মৃত্যুর মুখোমুখি বসেও তার চেতনায় বিস্ময় এবং কৌতূহল থাকে। পুরোপুরি কৌতূহলশূন্য সে বোধহয় কখনোই হয় না।

হিমু!

জি ভাইজান?

জিহ্বা বাইর কইরা আছেন কী জন্যে?

আমি কারণ ব্যাখ্যা করলাম। মুরগি ছাদেকের চোখ থেকে কৌতূহল দূর হয়ে গেল, তবে বিস্ময় দূর হলো না। সে চাপা গলায় বলল, আপনি আজিব লোক।

আমি বললাম, আমরা সবাই যার যার মতো আজিব। যে মশারা রক্ত খাচ্ছে তারাও আজিব।

মুরগি ছাদেক বলল, কথা সত্য। আজিবের উপরে আজিব হইল ক্ষিধা। এমন ক্ষিধা লাগছে! কিছুক্ষণ পরে যাব মইরা, লাগছে ক্ষিধা। চিন্তা করেন অবস্থা!

কী খেতে ইচ্ছা করছে?

ডিমের ভর্তা দিয়া গরম ভাত। পিঁয়াজ, কাঁচামরিচ আর সরিষার তেল দিয়া ঝাঁঝ কইরা ডিমের ভর্তা।

ডিমের ভর্তা আপনার মা করতেন?

হুঁ। ভাত খাওয়ার পরে একটা সিগারেট যদি ধরাইতে পারতাম।

সিগারেটের সাথে পান?

পানের দরকার নাই। পান খাই না।

ডিম ভর্তা, গরম ভাত, সিগারেট?

হুঁ।

আর কিছু না?

না। আর কিছু না।

খাওয়ার সাথে মিষ্টিজাতীয় কিছু লাগবে না? বিদেশে যাকে বলে ডেজার্ট।

আপনে অফ যান।

আমি তো অফ হয়েই ছিলাম। আপনি অন করেছেন। অন যখন করেছেন আসুন কিছু গল্পগুজব করি।

কী গল্প শুনতে চান?

বিয়ে করেছেন? ছেলেমেয়ে কী?

কাইল সকালে পত্রিকা খুললে সব সংবাদ পাইবেন। পত্রিকা পইড়া জাইনা নিয়েন।

খারাপ বলেন নাই। ভালো বলেছেন। আজরাইল যে দেখেছেন সেই বিষয়ে বলেন। এদের গায়ে কি গন্ধ আছে?

ভালো কথা মনে করাইছেন। গন্ধ আছে। কড়া গন্ধ।

কী রকম গন্ধ।

ওষুধের গন্ধের মতো গন্ধ। মিষ্টি মিষ্টি কিন্তু কড়া। বড়ই কড়া। আর কথা না। চুপ।

আমি চুপ হলাম।

দরজার তালা খোলার শব্দ হচ্ছে। মুরগি ছাদেক গুটিয়ে গেল। তার চোখে এখন তীব্র ভয়। পেট দ্রুত উঠানামা করছে। দরজার বাইরে ঘামবাবুকে দেখা যাচ্ছে। তিনি আঙুল ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি জিভ বের করে বসে ছিলাম। অ্যাক্সপেরিমেন্টের শেষ দেখার আগেই আমাকে উঠে যেতে হলো।

আবারো সেই ইন্টারোগেশন ঘর। সেই মধ্যমণি। তবে মধ্যমণি এখন অনেক স্বাভাবিক। তিনি স্যান্ডউইচ খাচ্ছেন। পাশে এক ক্যান কোক। স্যান্ডউইচে এক কামড় দেন। কোকের ক্যানে একটা চুমুক দেন। বাচ্চাদের মতো খাওয়া।

ঘামবাবু আমাকে দেখিয়ে বললেন, ভেরি স্ট্রেঞ্জ ক্যারেক্টার স্যার। দরজা খুলে দেখি সে হা করে জিহ্বা বের করে বসে আছে।

এমন একটা বিস্ময়কর ঘটনা শুনেও মধ্যমণির কোনো ভাবান্তর হলো না। তিনি স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি চলে যান। Released.

আমি বললাম, এত রাতে যাব কীভাবে?

মধ্যমণি বললেন, রাত বেশি না। একটা দশ।

একটা দশ অনেক রাত। এত রাতে বের হলে আপনাদের অন্য কোনো দল আমাকে ধরবে। একরাতে পর পর দু'বার ধরা পড়া ঠিক হবে না। আমাকে গাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসেন।

মধ্যমণি অবাক হয়ে বললেন, গাড়িতে করে নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে?

জি। আর আপনারা আমার ছয় কাপের মতো কফি নষ্ট করেছেন। রাস্তায় ফেলে দিতে হয়েছে। দশ টাকা করে ছয় কাপ কফির দাম হলো ষাট টাকা।

সেই ষাট টাকা দিতে হবে?

জি।

আর কিছু?

আপনারা মুরগি ছাদেককে ধরেছেন। তাকে রাতে ভাত খাওয়াতে হবে। গরম ভাত। সঙ্গে ডিমের ভর্তা। বেশি করে পিয়াজ মরিচ, সঙ্গে খাঁটি সরিষার তেল। এক আইটেমের খাওয়া। খাওয়া শেষ হলে একটা সিগারেট।

মধ্যমণির ঠোঁটের কোনায় হাসির আভাস। ঘামবাবুর চোখেমুখে বিরক্তি। উনি আমার বেয়াদবিতে বিরক্ত হয়ে চড় থাপ্পড় দিয়ে বসতেন। তাঁর সিনিয়র অফিসার আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শুনছেন বলে চড় থাপ্পড় দিতে পারছেন না। তবে তাঁর হাত যে নিশপিশ করছে এটা বোঝা যাচ্ছে।

মধ্যমণি বললেন, ছাদেককে ডিমের ভর্তা দিয়ে ভাত খাওয়াতে হবে কেন?

আমি বললাম, সে খেতে চেয়েছে। এবং আল্লাহপাক সেটা মঞ্জুর করেছেন।

আল্লাহপাক যদি মঞ্জুর করে থাকেন তাহলে উনি পাঠান না কেন? বেহেশত থেকে ফেরেশতা দিয়ে সোনার খাঞ্জায় পাঠিয়ে দিলেই হয়।

আল্লাহপাক সরাসরি কিছু করেন না। উসিলার মাধ্যমে করেন।

তুমি সেই উসিলা?

আমি একা না। আপনিও উসিলা। আমি আপনাকে বলব, আপনি ব্যবস্থা করবেন। এই হলো ঘটনা। আচ্ছা ভালো কথা, হামবাবুর ছেলেকে কি খবর দেয়া হয়েছে? বিদেশে যে ছেলে থাকে তাকে?

হামবাবুটা কে?

অজ্ঞান হয়ে যিনি পড়ে গেলেন তিনি। তাঁকে আমি হামবাবু ডাকি।

মধ্যমণির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। তিনি স্যান্ডউইচে কামড় দিতে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত দিলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, উনার ছেলে যে বিদেশে থাকে এটা তুমি জানো কীভাবে?

অনুমান করেছি। আমার অনুমান শক্তি ভালো।

মধ্যমণি বললেন, ছেলের নাম কী বলো।

নাম বলতে পারব না।

অনুমান করে বলো।

অনুমান করেও বলতে পারব না। আমার অনুমান শক্তি এত ভালো না।

মধ্যমণি আমাকে ষাটটা টাকা দিলেন। গাড়িতে করে আমাকে মেসে নামিয়ে দেবার হুকুম দিলেন। আমি বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, মুরগি ছাদেকের জন্য ডিম ভর্তার ব্যবস্থা কি হবে?

তিনি জবাব দিলেন না। আমি বললাম, যদি তাকে খাবার না দেয়া হয় তাহলে আমার কোনো কথা নাই। যদি দেয়া হয় তাহলে আমার একটা আবদার আছে।

মধ্যমণি কঠিন গলায় বললেন, তোমার আবার কী আবদার?

তার খাওয়াটা আমি দেখতে চাই। দূর থেকে দেখব। কাছে যাব না।

মধ্যমণি বললেন, Enough is enough. একে বিদেয় কর।

আমাকে বিদায় করা হলো।

আজকের খবরের কাগজের প্রধান খবর—

শীর্ষসন্ত্রাসী মুরগি ছাদেক
ক্রসফায়ারে নিহত

গোপন খবরের ভিত্তিতে কাওরানবাজার এলাকা থেকে র‍্যাব সদস্যরা মুরগি ছাদেককে গত পরশু ভোর পাঁচটায় গ্রেফতার করে। তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। তার দেয়া তথ্যমতে গোপন অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজে র‍্যাব সদস্যরা তাকে নিয়ে গাজীপুরের দিকে রওনা হয়। পথে মুরগি ছাদেকের সহযোগীরা তাকে মুক্ত করতে র‍্যাবের প্রতি গুলিবর্ষণ শুরু করে। র‍্যাব সদস্যরা পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই সুযোগে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পালিয়ে যাওয়ার সময় ক্রসফায়ারে মুরগি ছাদেক নিহত হয়। তার মৃতদেহের সঙ্গে পাঁচ রাউন্ড গুলিসহ একটি পিস্তল পাওয়া যায়।

মুরগি ছাদেকের বিরুদ্ধে এগারোটি হত্যা মামলাসহ একাধিক ছিনতাই, ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগের মামলা আছে।

তার মৃত্যু সংবাদে এলাকায় আনন্দ মিছিল বের হয়। এলাকাবাসীরা নিজেদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন।

আমি খবরটা মন দিয়ে পড়লাম। সবই ঠিক আছে, একটা শুধু সমস্যা। মুরগি ছাদেক পাঁচ রাউন্ড গুলি এবং পিস্তল নিয়ে র‍্যাবের সঙ্গে গাড়িতে বসেছিল? এত জিজ্ঞাসাবাদের পরেও কেউ বুঝতে পারে নি মুরগি ছাদেকের সঙ্গে গুলিভরা পিস্তল আছে?

ইন্টারেস্টিং খবর আর কী আছে?

মহিলা সমিতিতে কারা যেন নতুন নাটক নামিয়েছে— 'পবনবাবুর শেষ খায়েশ'।

মন্দ কী? সব মানুষের শেষ খায়েশ বলে একটা ব্যাপার থাকে। পবনবাবুর শেষ খায়েশ থাকতে পারে।

অশ্লীলতার দায়ে 'মাইরা ফালামু' ছবির প্রিন্ট জব্দ করা হয়েছে।

অনেকের জন্যে দুঃসংবাদ। নিরিবিলিতে ঘরে বসে ভিসিআর-এ বিদেশী অশ্লীলতা দেখার চেয়ে দল বেঁধে হলে বসে দেশী অশ্লীলতা দেখার মজা অন্য।

দেশরত্ন শেখ হাসিনার পুত্র জয়ের আগমণ।

ইন্টারেস্টিং খবর তো বটেই। দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান রাজনীতি করবেন, আর শেখ হাসিনা চুপ করে বসে থাকবেন, তা হবে না। এবার হবে পুত্রে পুত্রে লড়াই। আমরা নিরীহ দেশবাসী মজা করে দেখব।

পত্রিকা ভর্তি ইন্টারেস্টিং খবর। কোনটা রেখে কোনটা পড়ব? আজ ছুটির দিন বলে পত্রিকার সঙ্গে আছে সাহিত্য সাময়িকী। সাম্প্রতিক গদ্য-পদ্যের মধু মিলন পাঠ করা যাবে। একটা গল্প ছাপা হয়েছে আজাদ রহমান নামের এক লেখকের। গল্পের নাম— 'কোথায় গেল সিম কার্ড?'

মনে হচ্ছে খুবই আধুনিক গল্প। গল্পকার নিশ্চয়ই হারিয়ে যাওয়া সিম কার্ডের রূপকে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির কথা বলেছেন।

বেশ কয়েকটা কবিতা ছাপা হয়েছে, এর মধ্যে একটা কবিতার নাম— 'আড়াই বিঘা জমি'।

এই কবি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আধ বিঘা বড়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন দুই বিঘার কবিতা। ইনি লিখেছেন আড়াই বিঘার।

প্রতিটি সাহিত্যকর্ম মন দিয়ে পড়া উচিত। পড়া সম্ভব হবে না, কারণ পত্রিকা আমার না। পত্রিকা মেস ম্যানেজার জয়নালের। তার কাছ থেকে পাঁচ মিনিটের জন্যে ধার এনেছিলাম মুরগি ছাদেকের খবর পড়ার জন্যে।

সাধারণত ছুটির দিনগুলিতে আমার কাজকর্ম থাকে সবচে' বেশি। এই দিনটি আমি সামাজিক দেখা-সাক্ষাতের জন্যে রেখে দেই। আমার যে সব আত্মীয়স্বজন আমাকে দেখে মহাবিরক্ত হন তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে যাই। মানুষকে বিরক্ত করার মজাই অন্যরকম।

আজ কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। হাত-পা এলিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। ঘুম ঘুম চোখে শুয়ে থাকব। মাথার উপর ফ্যান ঘুরবে। একটা শীত

শীত ভাব। গায়ে চাদর টেনে দিতে ইচ্ছা করছে, আবার করছে না, এমন অবস্থা। হাতের কাছে মজাদার কোনো বই থাকবে। ইচ্ছা হলো বই থেকে একটা দুটা পাতা পড়লাম। বইয়ের যে-কোনো জায়গা থেকে যে-কোনো দুটা পাতা।

বইয়ের কথা থেকে মনে পড়ল 'চেঙ্গিস খান' বইটা আনা হয় নি। চা এবং কফির ফ্লাস্ক নিয়ে এসেছি, কিন্তু চেঙ্গিস খান সাহেবকে রেখে এসেছি। খান সাহেবকে আনার জন্য র‍্যাবের হেড অফিসে যাওয়াটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে?

চা-কফির ফ্লাস্কের মালিক বজলুকে খুঁজে বের করার একটা চেষ্টা চালাতে হবে। তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার ব্যবসা যেন চালু থাকে সেটা দেখতে হবে। চা-কফি বিক্রি বন্ধ হবে না। ফ্লাস্কভর্তি চা কফি নিয়ে বের হতে হবে। ছুটির দিনে ভালো বিক্রি হবার কথা।

চা এবং কফি দু'টাই সবচে' ভালো বানান আমার বড় খালা মাজেদা বেগম। তাঁর কাছ থেকে ফ্লাস্ক ভর্তি করে আনা যেতে পারে। আজ অনেক কাজ।

ম্যানেজার জয়নালকে খবরের কাগজ ফেরত দিলাম। সে বলল, আজ দুপুরে কিন্তু মেসে খাবেন হিমু ভাই। ইমপ্রুভড ডায়েট।

আমি বললাম, মেন্যু কী?

প্লেইন পোলাও, খাসির রেজালা আর দই।

শুধু দই? দই-মিষ্টি না?

শুধু দই। দই-মিষ্টি দিলে পুষে না।

গেস্ট অ্যালাউড?

জি অ্যালাউড। পার গেস্ট একশ টাকা। আপনার গেস্ট আছে?

দুইজন গেস্ট।

অ্যাডভান্স টাকা দিতে হবে হিমু ভাই।

অ্যাডভান্স টাকা আমি পাব কোথায়?

আচ্ছা থাক আপনাকে দিতে হবে না। আমি জিম্মাদার। হিমু ভাই, কাগজে পড়েছেন মুরগি ছাদেককে র‍্যাব শেষ করে দিয়েছে?

পড়েছি।

আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করি নাই। তারপর দেখলাম সত্যি। খুবই আনন্দ পেয়েছি। আমার হাতে টাকা থাকলে র‍্যাব ভাইদের একদিন ইমপ্রুভড ডায়েট খাওয়ায়ে দিতাম। ডাণ্ডা মেরে সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে। এই দেশে ডাণ্ডা ছাড়া কিছু হবে না। ঠিক বলেছি না?

অবশ্যই ঠিক বলেছেন। আমাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে ডাণ্ডা। কারো বড় ডাণ্ডা কারো ছোট ডাণ্ডা। জয়নাল ভাই, বিদায়।

দুপুরে কিন্তু চলে আসবেন। আপনি এবং দুইজন গেস্ট।

আমি মোটামুটি দুশ্চিন্তা নিয়েই বের হলাম। গেস্ট পাব কোথায়? ঝোঁকের মাথায় দু'জন গেস্টের কথা বলেছি। একজনের নাম হালকাভাবে মাথায় আছে। বজলু। মনে হচ্ছে দুপুরের মধ্যে তাকে পেয়ে যাব। দ্বিতীয়জন পাব কোথায়? খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় আমিরুল মুমেনিনরা খাবার সময় পথে বের হতেন। দুস্থজনদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন। আমিও সেরকম কিছু কি করব? দুস্থ কেউ এসে একবেলা প্লেইন পোলাও রেজালা খেয়ে যাক।

মেসের মুখেই একজন ভিখিরি পাওয়া গেল। মুখভর্তি দাড়িগোঁফের জঙ্গল। মাথায় বেতের টুপি। তবে বলশালী চেহারা। উনার গানের গলা ভালো। চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকিয়ে বেশ আয়োজন করে গাইছেন—

দিনের নবি মোস্তফায়
রাস্তা দিয়া হাঁইটা যায়
ছাগল একটা বান্দা ছিল
গাছেরও তলায়।

আমি গায়ক ফকিরের সামনে কিছুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম। একবার মনে হলো যেহেতু প্রথম উনার সঙ্গে দেখা উনাকেই দাওয়াত দিয়ে দেই।

ফকির চোখ মেলে গান থামিয়ে বলল, স্যার, আসসালামু আলায়কুম।

ফকিররা সালাম দেয় না। তারা প্রথম সুযোগেই ভিক্ষা চায়। এর ঘটনা কী? ইমপ্রুভড ডায়েটের মতো ইমপ্রুভড ফকির?

ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? আপনার গানের গলা তো সুন্দর।

গায়ক ফকির বিনয়ে মাথা নিচু করে ফেলল।

আপনার গানের কথায় সামান্য সমস্যা আছে, এটা জানেন?

কী সমস্যা?

আপনি বলছেন— 'ছাগল একটা বান্দা ছিল গাছেরও তলায়'। নবিজীর দেশে ছাগল পাওয়া যায় না। গানের কথা সামান্য চেঞ্জ করে দেন। ছাগলের জায়গায় বলেন দুম্বা। 'দুম্বা একটা বান্দা ছিল গাছেরও তলায়।'

গায়ক ফকির ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। ফকিররা এমন দৃষ্টিতে কখনো তাকায় না। সমস্যাটা কী?

ফকির সাহেব!

জি স্যার।

আপনি কি দুপুর পর্যন্ত এখানেই থাকবেন, না জায়গা বদলাবেন?

ফকির চুপ করে আছে। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

আপনি যদি দুপুর পর্যন্ত এখানে থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে খানা খাবেন। ঠিক আছে?

কী জন্যে?

আপনি ভিক্ষুক মানুষ, আপনাকে খেতে বলেছি আপনি খাবেন। প্রশ্ন কিসের? দাওয়াত কি কবুল করেছেন?

ভিখিরি জবাব দিল না। তার ভাবভঙ্গি বলছে সে দাওয়াত কবুল করে নি। আমি হাঁটা দিলাম। একবার পেছনে তাকালাম। গায়ক ফকির গান বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এত দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, তারপরেও মনে হলো তার ভুরু এখনো কুঁচকানো।

মাজেদা খালা বললেন, অ্যাই, তোকে র‍্যাব ধরেছিল নাকি? গভীর রাতে টেলিফোন। আমার তো কলিজা নড়ে গিয়েছিল। র‍্যাব তোকে কী করল?

ছেড়ে দিল।

মারধোর করে নাই?

না।

মারধোর করল না এটা কেমন কথা! পুলিশে ধরলেও তো মেরে তক্তা বানিয়ে দেয়। তোকে মারল না কেন?

আমি তো জানি না খালা। জিজ্ঞেস করি নি। তোমার কাছে জরুরি কাজে এসেছি। কাজটা আগে সারি। এই যে দুটা ফ্লাস্ক দেখছ, একটা ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা বানিয়ে দেবে, আরেকটা ফ্লাস্ক ভর্তি কফি।

খালা বললেন, র‍্যাব তাহলে ঠিকই বলেছিল, তুই ফেরিওয়ালা হয়েছিস। চা-কফি ফেরি করিস। প্রথমে আমি র‍্যাবের কথা বিশ্বাস করি নি। তুই সত্যি ফেরি করিস?

হুঁ।

কোথায় কোথায় যাস?

যেখানে মানুষের আনাগোনা সেখানেই যাই।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাস?

যাই।

গুড। তাহলে তুই আমাকে একটা কাজ করে দিতে পারবি। ইউ আর দি পারসন। ঘন ঘন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাবি। চোখ-কান খোলা রাখবি।

কেন?

মাজেদা খালা গলা নামিয়ে বললেন, তুই লক্ষ রাখবি তোর খালু সাহেব সেখানে যায় কি-না। আমাকে বলেছে যায় না। তবে আমি নিশ্চিত সে যায়। কীভাবে নিশ্চিত হলাম শোন। একদিন সে আমাকে বলল, ধানমণ্ডি লেকের পাড়ে হাঁটতে যাচ্ছি। আমি বললাম, যাও। সে ট্রেকস্যুট পরে বের হয়ে গেল। আমিও কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত। তোর খালুর টিকির দেখাও পেলাম না।

আমিও খালার মতো গলা নামিয়ে বললাম, খালু সাহেবের কি কোনো প্রেম ট্রেম হয়েছে না-কি?

মাজেদা খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, এই বয়সে প্রেম হবে কী? অন্য ব্যাপার?

অন্য কী ব্যাপার?

মেয়েদের সঙ্গে ছুকছুকনি করার রোগ হয়েছে। বুড়ো বয়সে এই রোগ হয়। বাজে টাইপের একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে। মেয়েটার নাম ফ্লাওয়ার।

মেয়ের নামও তুমি জানো?

জানব না কেন? তোর খালু চলে ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়, আর তুই চলবি শিরায় শিরায়। তুই এই দু'জনের ছবি তুলে নিয়ে আসবি।

ছবি যে তুলব ক্যামেরা পাব কোথায়?

ক্যামেরা লাগবে না, আমি তোকে নতুন একটা মোবাইল দিয়ে দিচ্ছি। এই মোবাইলে ছবি উঠে। কীভাবে ছবি উঠে তোকে দেখিয়ে দেব। কাজ শেষ হলে মোবাইল ফেরত দিবি। অনেক দামি মোবাইল। আর শোন, ছবি যে তুলবি জুম করে ক্লোজে চলে যাবি। চেহারা যেন বোঝা যায়।

তুমি যা যা করতে বলবে সবই করব। এখন থেকে সকাল আটটায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাব, রাত বারোটা পর্যন্ত ঘাপটি মেরে বসে থাকব।

সাবধানে থাকবি তোকে যেন দেখে না ফেলে। দেখে ফেললে সাবধান হয়ে যাবে।

তুমি নিশ্চিত থাক খালা। দেখলেও চিনবে না। আমি যাব ছদ্মবেশে। ফকিরের ছদ্মবেশ নেব। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ, কাঁধে ঝোলা। ঝোলার ভেতর মোবাইল ক্যামেরা। কণ্ঠে গান।

কণ্ঠে গান মানে?

গান গেয়ে ভিক্ষা করব,

দিনের নবি মোস্তফায়
রাস্তা দিয়া হাঁইটা যায়
দুস্বা একটা বান্ধা ছিল
গাছেরও তলায়।

মাজেদা খালা বললেন, তুই পুরো ব্যাপারটা ফাজলামি হিসেবে নিয়েছিস, আমি কিন্তু সিরিয়াস।

আমি বললাম, খালা, আমিও সিরিয়াস। সিরিয়াস বলেই ছদ্মবেশে যাচ্ছি। তুমি ফ্লাস্ক ভর্তি করে দাও, আমি এক্ষুনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চলে যাচ্ছি। খালু সাহেব এবং ফ্লাওয়াকে ধরা হবে লাল হাতে।

ধরা হবে লাল হাতে মানে কী?

ধরা হবে লাল হাতের মানে হলো— Caught red handed. খালা, আর দেরি করা যাবে না। এক্ষুনি রওনা হতে হবে।

মাজেদা খালা বললেন, তাড়াহুড়ার কিছু নাই। তোর খালু সাহেব কখন জগিং করতে যায় আমি জানি। যখনই সে জগিং ট্রেক গায়ে দিবে তখনই আমি তোকে মোবাইলে জানিয়ে দেব। তুই কি সত্যই দাড়িগোঁফ লাগিয়ে ফকির সাজবি?

অবশ্যই। প্যাকেজ নাটকের একজন মেকাপম্যান আছেন আমার পরিচিত। রহমান মিয়া। আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি তার কাছে। Action action, direct action.

মেকাপ নেয়ার পর আমাকে দেখিয়ে যাবি না?

তোমার বাড়িতে আসা যাবে না। খালু সাহেব টের পেয়ে যাবেন।

তাও ঠিক।

তবে আমি নিজের ছবি তুলে রাখব। তুমি ছবি দেখে বুঝবে গেটাপ কেমন হয়েছে। এখন মোবাইলে ছবি কীভাবে উঠাতে হবে আমাকে শিখিয়ে দাও।

খালা মহাউৎসাহে শেখাতে শুরু করলেন। তাঁকে কিশোরীদের মতো উত্তেজিত এবং আনন্দিত মনে হলো। তাঁর জীবনে আনন্দিত এবং উত্তেজিত হবার ঘটনা বেশি ঘটে না। এইবার ঘটল। ভাগ্যিস ফ্লাওয়ারের সঙ্গে খালু সাহেবের দেখা হয়েছে।

রহমান মিয়া খুবই আগ্রহ নিয়ে দাড়িগোঁফ দিয়ে আমাকে সাজিয়ে দিলেন। একটা দাঁতে রঙ লাগিয়ে দিলেন। হা করলে মনে হয় একটা দাঁত নেই। তাঁর কাছে সব জিনিসপত্রই আছে। একটা ছেঁড়া ময়লা লুঙি পরলাম, কালো গেঞ্জি গায়ে দিয়ে একশ' পারসেন্ট ভিখিরি হয়ে গেলাম।

নিজের শিল্পকর্ম দেখে রহমান ভাই নিজেই মুগ্ধ। আনন্দিত গলায় বললেন, হিমু ভাই, কোনো শালার পুত আপনারে চিনবে না। যদি চিনতে পারে আমি মাটি খাব।

দুই হাতে দুই ফ্লাস্ক নিয়ে লেংচাতে লেংচাতে আমি মেসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। নিমন্ত্রিত গায়ক ফকির এখনো আছেন। তবে তিনি গান গাইছেন না। আমাকে দেখে তিনি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। যেন জগতের অষ্টম আশ্চর্য চোখের সামনে দেখছেন। আমি লেংচাতে লেংচাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় বললাম, আমারে চিনেছেন?

গায়ক ফকির হাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, বলুন তো আমি কে?

গায়ক ফকির ছোট্ট একটা ভুল করে ফেলল। সে বলল, আপনি হিমু।

আমি বললাম, আমার নাম তো আপনার জানার কথা না। নাম জানলেন কীভাবে?

গায়ক নিশ্চুপ।

আমি বললাম, আপনি কি র‍্যাবের কেউ? ফকির সেজে মেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন?

গায়ক এখনো চুপচাপ।

আমি বললাম, আপনি আমার নিমন্ত্রিত অতিথি, চলুন খেতে যাই।

গায়ক নিঃশব্দে আমার পেছনে পেছনে আসছে। বেচারা আজ বড় ধরনের একটা ধাক্কা খেয়েছে।

হিমু ভাই না ?

হুঁ।

ঘটনা কী ?

প্যাকেজ নাটকে একটা রোল পেয়েছি। ফেরিওয়ালা। সন্ধ্যার পর স্যুটিং।

নাটকের নাম কী ?

নাটকের নাম 'ফ্লাওয়ার'। ইংরেজি নাম।

আপনার সাথের ঐ লোক কে ? একটু আগে দেখেছি ভিক্ষা করছে।

সেও একজন অভিনেতা। র‍্যাবের ভূমিকায় অভিনয় করছে। ভিক্ষুকের বেশে র‍্যাব।

ও আচ্ছা।

আমাদের খাবারটা আমার ঘরে পাঠিয়ে দেন। মেসের সবাইকে প্যাকেজ নাটকের খবর জানানোর দরকার নাই।

জয়নাল বলল, আপনার আরেক গেস্ট কোথায় ?

নাটকের ডাইরেক্টর সাহেবের আসার কথা ছিল। কাজে আটকা পড়েছেন।

হিমু ভাই, স্যুটিং দেখতে পারব না ?

স্যুটিং দেখবেন। আজ না।

দুইজন গেস্টের জায়গায় আমার এখন একজন গেস্ট। গেস্টের খাবার গতি ও পরিমাণ দেখে আমি মুগ্ধ। নিমিষের মধ্যে সব নেমে গেল। ভদ্রলোক অতি তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছেন। তৃপ্তির খাওয়া দেখতেও তৃপ্তি। আমি বললাম, ভাই পেট ভরেছে ?

তিনি বললেন, খুবই আরাম করে খেয়েছি। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। আমি পরিমাণে বেশি খাই। এই নিয়ে লজ্জার মধ্যে থাকি। সব জায়গায় ঠিকমতো খেতেও পারি না। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে আধপেটা খেয়ে উঠে পড়ি। আপনার এখানে আরাম করে খেলাম।

কোনো চক্ষুলজ্জা বোধ করেন নাই ?

জি-না।

এখন কী করবেন ? চলে যাবেন, না-কি এখনো ফকির সেজে গান করবেন ?

বুঝতে পারছি না।

আপনার গানের গলা ভালো। রেডিও টিভিতে অডিশন দিলে পাশ করবেন।

আমি রেডিও অডিশনে পাশ করা।

তাই না-কি ?

গান বাজনার লাইনে থাকতে চেয়েছিলাম, পেটের দায়ে ঢুকলাম পুলিশে। সেখান থেকে র‍্যাব। একটা পান খেতে পারলে ভালো হতো।

পান আনিয়ে দিচ্ছি। জর্দা লাগবে ?

জি লাগবে। জর্দা ছাড়া পান আর নিকোটিন ছাড়া সিগারেট একই জিনিস।

জর্দা দেয়া পান আনিয়ে দিলাম। তিনি যেরকম তৃপ্তির সঙ্গে খাবার খেয়েছেন সেরকম তৃপ্তির সঙ্গে জর্দা দেয়া পান চিবাতে লাগলেন। আমি বললাম, সিগারেট খাবেন ?

ভদ্রলোক বললেন, সিগারেটের অভ্যাস নাই। তারপরেও একটা দিন, খাই। সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কী ভয়!

শয্যা যখন পেতেছেন ঠিকমতো পাতেন। শুয়ে একটা ঘুম দেন।

ঘুম দিব মানে ?

ভালো খাওয়ার পর আরামের একটু ঘুমও খাবারেরই অংশ। পাঁচ দশ মিনিট না ঘুমালে লাঞ্চ কমপ্লিট হবে না।

সত্যি ঘুমাতে বলছেন ?

আপনার ইচ্ছা। আমি ঘর ছেড়ে দিলাম। আমার ঘরের দরজায় কখনো তালা দেয়া থাকে না। সবসময় খোলা। যখন চলে যেতে ইচ্ছা করবে চলে যাবেন।

আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

আমি চা এবং কফি ফেরি করব।

ফিরবেন কখন ?

বলতে পারছি না।

তাহলে কিছুক্ষণ শুয়েই থাকি ?

থাকুন। আপনার নাম জানা হলো না।

আমার নাম হারুন। হারুন-আল-রশিদ। বাগদাদের খলিফা।

আমি বললাম, বাগদাদের খলিফা দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য হলেও চোখ বন্ধ করে আরাম করবে না তা হয় না।

হারুন-আল-রশিদ আনন্দিত গলায় বললেন, অতি সত্যি কথা। হিমু ভাই, আমি শুয়ে পড়লাম।

আজ প্রথমদিনের মতো বিক্রি হচ্ছে না। অনেকেই কাছে আসছে, তবে চা-কফির জন্যে না, গলা নিচু করে বলছে— পুরিয়া আছে? পুরিয়া?

শুরুতে ভেবেছিলাম পুরিয়া হলো গাঁজা। পরে বুঝলাম পুরিয়া বলতে হিরোইনের পুরিয়া বোঝাচ্ছে। ঢাকা শহরের পার্কগুলিতে প্রকাশ্যে পুরিয়া কেনাবেচা হয় এই তথ্য জানা ছিল না।

এর মধ্যে মাজেদা খালার টেলিফোন।

অ্যাই তুই কোথায়?

পার্কে?

দাড়িগোঁফ লাগিয়ে গিয়েছিস?

হুঁ।

সত্যি, না আমার সঙ্গে লাফাংগাগিং করছিস?

সত্যি পার্কে।

তোর খালুর দেখা পেয়েছিস?

না।

সে তো কেডস ফেডস পরে সেজেগুজে বের হয়েছে। খুঁজে দেখ। মেয়েটার নাম মনে আছে, না ভুলে গেছিস?

নাম মনে আছে— সানফ্লাওয়ার। সূর্যমুখি।

তোর মতো গাধাকে দিয়ে তো কোনো কাজই হবে না। সানফ্লাওয়ার না। শুধু ফ্লাওয়ার। পুষ্প।

খালা এক মিনিট, খালু সাহেবের মতো একজনকে দেখা যাচ্ছে। আজ কি উনার মাথায় সবুজ ক্যাপ?

হুঁ। তাড়াতাড়ি পিছনে লেগে যা। ছবি কীভাবে তুলতে হয় মনে আছে?

মনে আছে।

দশ মিনিট পর আমি আবার টেলিফোন করব।

তোমার করতে হবে না। আমিই করব।

না না তোকে করতে হবে না। তুই ভুলে যাবি। আমিই টেলিফোন করব। দশ মিনিট পর করব।

মাজেদা খালা পাঁচ মিনিটের মাথায় টেলিফোন করলেন। কথা বলছেন ফিসফিস করে।

হিমু। অ্যাই হিমু।

হুঁ।

তোর খালু কোথায়?

বাদাম খাচ্ছে।

বাদাম খাচ্ছে?

হুঁ।

হেভি খাওয়া দাওয়ায় আছে। ঐ মেয়ে কোথায়?

মনে হয় তাঁর পাশে।

তুই কি গুছিয়ে কথা বলা ভুলে গেছিস। তার পাশে মানে কী?

উনার পাশে একটা মেয়ে বসে আছে। সে সূর্যমুখি কি-না তা জানি না।

তুই বারবার সূর্যমুখি বলছিস কেন? ঐ বদ মেয়েটার নাম ফ্লাওয়ার। শুধু ফ্লাওয়ার।

এই মেয়েটাই ফ্লাওয়ার কি-না তা তো জানি না। আমি তো তাকে আগে দেখি নি।

মেয়েটা দেখতে কেমন?

দেখতে খুবই সুন্দর। পরী টাইপ।

তোদের পুরুষদের চোখে পৃথিবীর সব মেয়েই খুবই সুন্দর। মেয়েটা করছে কী?

বাদাম খাচ্ছে।

সেও বাদাম খাচ্ছে?

হুঁ।

ছবি তুলেছিস?

না।

আরে গাধা এক্ষুনি ছবি তোল। আলো কমে গেলে ছবি উঠবে? এমনভাবে তুলবি যেন মেয়েটার Face পুরোপুরি পাওয়া যায়। তারপর জুম করবি। মেয়েটা কী পরেছে?

শাড়ি।

শাড়ির রঙ কী?

শাড়ির রঙ দিয়ে কী হবে?

দরকার আছে।

গোলাপি।

ছবি তোল। ছবি তোলার পর আমাকে জানা। জুম করার কথা মনে আছে?

আছে।

আমি টেনশন আর নিতে পারছি না। তুই ছবি তোল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি খালাকে জানালাম যে ছবি তোলা হয়েছে এবং জুম করা হয়েছে।

মাজেদা খালা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আমি বললাম, খালু সাহেবকে কি আজই ধরা হবে?

মাজেদা খালা বললেন, ছয়-সাতদিন ধরে ক্রমাগত তার ছবি তোলা হবে। তারপর তাকে ধরব। কচ্ছপের কামড়। এই সাতদিনে তোর খালু সাহেব কিছুই বুঝতে পারবে না। আমি লক্ষ্মী বউয়ের মতো আচার আচরণ করব।

আমি বললাম, গুড গার্ল।

খালা ধমক দিয়ে বললেন, কী বললি?

গুড গার্ল বলেছি।

আমি তোর কাছে গুড গার্ল! সবসময় ইয়ারকি? সবসময়?

সরি।

হিমু শোন, নায়ক-নায়িকা এখন কী করছে?

এখন কী করছে তা তো জানি না। আমি তো আর ওখানে নাই।

খালা হাহাকার করে উঠলেন, ওদেরকে এইভাবে রেখে চলে এসেছিস? তুই কি পাগল? তোর কি ব্রেইন পচে গু হয়ে গেছে?

আমি সারাক্ষণ পিছনে লেগে থাকব?

অবশ্যই। ডিটেকটিভ বই-এ কী লেখা থাকে? টিকটিকি কী করে? ছায়ার মতো লেগে থাকে। এখন থেকে তুই আমার টিকটিকি। যা, আবার ফিরে যা। কী করছে দেখ। যদি দেখিস হাত ধরাধরি করে বসে আছে, ছবি তুলবি।

ছবি তুলব কীভাবে! অন্ধকার হয়ে গেছে তো।

অন্ধকার হোক আর যাই হোক, ছবি তুলবি।

খালা, আমার দাড়ি খানিকটা লুজ হয়ে গেছে, যে-কোনো মুহূর্তে খুলে পড়তে পারে।

খুলে পড়লে খুলে পড়বে। তুই তো দাড়ি দিয়ে ছবি তুলবি না। তুই ছবি তুলবি সেল ফোনে।

Ok.

ওকে ফকে বাদ দে। ছবি তোল।
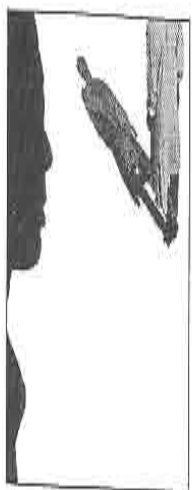
বজলু ছেলেটা যথেষ্ট ভোগাল। যে ঠিকানাটা পাওয়া গেছে সেটা ঠিক কি-না কে জানে। ঢাকা শহরের মানুষ উল্টাপাল্টা ঠিকানা দিতে পছন্দ করে। ঠিকানাবিহীন মানুষজনের ঠিকানা হয় ভাসমান। এক জায়গায় স্থির থাকে না। ভাসতে থাকে। ভেসে দূরে চলে যাবার আগেই ধরে ফেলতে হবে। রাত বাজে দশটা। রাত যত গভীর হবে ঠিকানায় মানুষ খুঁজে পাওয়া ততই সহজ হবে। এই ধরনের লোকজন সারাদিন হাঁটাহাঁটি করে রাতে ঘুমুতে আসে।

বজলুর ভাসমান ঠিকানা উত্তরার রাজলক্ষ্মী কমপ্লেক্সের পেছনের ছাপড়া বস্তি। সে তার বাবা শাহ সাহেবের সঙ্গে থাকে। শাহ সাহেব রঙের মিস্ত্রি। এবং ছোটখাট পীর। গাড্ডুর সাধনা আছে। গাড্ডু জীন প্রজাতির জিনিস। ক্ষমতা জীনের মতো না। বনে জঙ্গলে থাকে বলে গাছপালা চিনে। গাছপালা থেকে ওষুধ দেয়। শাহ সাহেব সামান্য হাদিয়ার বিনিময়ে এইসব ওষুধ অন্যকে দেন। শাহ সাহেবকে অনেকে গাড্ডু পীরও বলেন।

শাহ সাহেবকে অতি সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। তিনি ঘরের সামনে উঠান মতো জায়গায় খালি গায়ে বসে ঝালমুড়ি খাচ্ছেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গাড্ডু পীর চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু ভাইজান না? এতদিন পরে দেখা, আমি কিন্তু ঠিকই চিনেছি। আমারে চিনেছেন?

না।

লাইলাহা ইল্লাললাহু! আমি খসরু। এখন চিনছেন?

না।

ঠেলাগাড়ি চালাইতাম। অ্যাক্সিডেন্ট করছিলাম। ঠ্যাং গেল ভাইঙ্গা। চিকিৎসার ব্যবস্থা আপনে করলেন। এখন যদি বলেন চিনি না, আমি যাব কই? মুখভর্তি দাড়ি, এইজন্যে বোধহয় চিনেন না। আপনে হুকুম দিলে নাপিতের দোকান থাইক্যা মুখ কামাইয়া আসি।

পীর হয়েছ শুনলাম।

স্বপ্নে একটা জিনিস পেয়েছি।

কী পেয়েছ গাড্ডু?

এই বিষয়ে কথাবার্তা পরে বলব। আপনে আমার সামনে— এখনো বিশ্বাস হইতেছে না।

তোমার ছেলে কই? বজলু?

বজলুরে চিনেন ক্যামনে? আমারে চিনেন না, বজলুরে চিনেন! আজিব ব্যাপার।

তোমার ছেলে আমার কাছে চা-কফির ফ্লাস্ক রেখে দৌড় দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ফ্লাস্ক ফেরত দিতে এসেছি।

ও আচ্ছা। আপনে সেই লোক। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু। এখন আমার কাছে সব কিলিয়ার। বজলু বাড়িত আসুক, দেখেন তারে কী করি। উল্টাপাল্টা কথা বলছে আপনেরে নিয়া। আমিও এমন বেকুব, হারামজাদার কথা বিশ্বাস করছি।

কী বলেছে?

বলছে এক বদ লোক কফি খাইছে। টেকা না দিয়া জোর কইরা ফ্লাস্ক রাইখা দিছে। কফি কি আপনে খাইছিলেন হিমু ভাই?

হুঁ। টাকা দিতে পারি নাই। কীভাবে দিব? টাকা আছে না-কি আমার সঙ্গে!

অতি সত্য কথা। আপনের সঙ্গে টেকা থাকব কী জন্যে? বজলু হারামজাদা আপনেরে কফি খাওয়াইয়া টেকা চায়! এত বড় সাহস। আমারে কত বড় শরমের মধ্যে ফেলছে চিন্তা করেন হিমু ভাই। আমার মন এখন অত্যধিক খারাপ। দৌড় দিয়া কোনো ট্রাকের সামনে পড়লে মন শান্ত হইত।

গাড্ডু পীর বিরাট হৈচৈ শুরু করল। কী করলে হিমু ভাইয়ের প্রতি সঠিক সম্মান দেখানো হবে বুঝতে পারছে না। উত্তেজনায় তার মুখে ঘাম জমে গেছে।

বজলু তার মাকে নিয়ে বাজার করতে গিয়েছিল। সেও এসে আমাকে চিনতে পারল না। গাড্ডু পীর বলল, চিনস না-চিনস কানে ধইরা খাড়ায়া থাক।

বজলু কানে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তাকে ফ্লাস্ক এবং এই ক'দিনের চা-কফি বিক্রির টাকা বুঝিয়ে দিলাম।

গাড্ডু পীর হুঙ্কার দিয়ে বলল, এখন চিনছস কি-না বল।

বজলু মাথা নাড়ল। চিনেছে।

গাড্ডু পীর গভীর হতাশায় বলল, এই মানুষটার কাছে তুই কফির দাম চাইছস? আফসোস। বিরাট আফসোস।

বজলু বলল, আমি উনারে চিনব ক্যামনে?

গাড্ডু পীর বলল, আরে ব্যাটা, চোখের দেখায় চিনবি না। ধ্যানে চিনবি। মানুষ ধ্যানে চিনা যায়। চোখের দেখায় চিনা যায় না।

আমি বললাম, খসরু, আমি উঠি?

খসরু মনে হয় আকাশ থেকে পড়ল। যেন 'আমি উঠি'র মতো বাক্য সে তার ইহজীবনে শোনে নি।

হিমু ভাই, এইটা আপনে কী বললেন? রাইত বাজে এগারোটা। আপনে আমার বাড়ি থাইকা না খায়া যাবেন? পোলাও কোরমা পাক হবে, ঝাল গোশত হবে। তারপরে যাওয়া যাওয়ির কথা। খাবেন না বললে আমি কিন্তু সত্যই লাফ দিয়া টেরাকের নিচে পড়ব।

আমাকে হার স্বীকার করতে হলো। রান্নাবাড়ার বিপুল আয়োজন শুরু হয়ে গেল। বজলু এবং তার বাবা মুরগি, গরুর মাংস, পোলাওয়ের কালো জিরা চাল কিনতে চলে গেল। আমি খসরুর স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছি। তার নাম জরিনা বেগম।

জরিনা বেগম ছোটখাট মহিলা। চেহারা মায়াকাড়া। গলার স্বর মিষ্টি। কথাও বলে গুছিয়ে। কথা শুনে মনে হয় কিছু পড়াশোনাও করেছে। সে বলল, ভাইজান, আপনে আপনের শিষ্যরে বলেন, মানুষ যেন না ঠকায়। যে মানুষ ঠকায় সে নিজে ঠকে। আল্লাহপাকের হিসাব সোজা হিসাব। আল্লাহপাক জটিল হিসাব করেন না। উনার হিসাব খালি যোগ আর বিয়োগ।

আমি বললাম, গাড্ডু পীর মানুষ ঠকায়?

অবশ্যই। সে নাকি স্বপ্নে পীরাতি পাইছে। ভাইজান, আপনে বলেন স্বপ্নে কোনদিন কে কী পাইছে? যেই জিনিস স্বপ্নে পাওয়া যায় সেই জিনিস স্বপ্নেই শেষ।

ঠিকই বলেছ।

ছেলে বড় হইছে, তারে ইস্কুলে দেয় না। এই কাম করায় সেই কাম করায়। আপনে একটা ধমক দিলে ছেলেরে ইস্কুলে দিব।

আমার ধমক শুনবে?

অবশ্যই শুনব। আপনে তার পীরের পীর। আপনের একটা কথায় সে জীবন দিয়া দিবে। ভাইজান, আপনে বইল্যা আমার ছেলেরে ইস্কুলে পাঠাইবেন।

আচ্ছা দেখি।

আমি একদিন খোয়াবে দেখছি, বজলু লেখাপড়া কইরা বিরাট অফিসার হইছে। কচুয়া রঙের একটা মোটরগাড়ি আইন্যা আমারে ডাকতাছে— মা, গাড়ি আনছি। গাড়িতে উঠ। আমি বজলুর বাপরে নিয়া গাড়িত উঠলাম। স্বপ্ন গেল ভাইঙ্গা।

জরিনা বেগমের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, আপনে যখন বজলুর সন্ধানে উপস্থিত হইছেন, তখন বুঝছি আমার ছেলেরে নিয়া যে খোয়াব দেখছি সেইটা সত্য।

আমি বললাম, একটু আগে তুমি বলেছ, যে জিনিস স্বপ্নে পাওয়া যায় সেই জিনিস স্বপ্নেই শেষ।

জরিনা বেগম বলল, আপনার সাথে কথায় আমি পারব না ভাইজান। আমি আপনেরে আমার দিলের কথা বলেছি। আমার আর কিছু বলার নাই।

জরিনা বেগমের রান্না অসাধারণ। আমি খুবই তৃপ্তি নিয়ে খেলাম। বেশ কয়েকবার মনে হলো, র‍্যাবের হারুন-আল-রশিদ'কে নিয়ে এলে ভালো হতো। প্রচুর আয়োজন। ভরপেট খেতে তার অসুবিধা হতো না।

খাওয়া শেষ করে পান মুখে দিয়ে ঘর থেকে বের হবার আগে আগে বজলুকে বললাম, আই ব্যাটা, খোঁজখবর করে কাল একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে যাবি। পরেরবার এসে যদি দেখি স্কুলে ভর্তি হস নাই, থাপ্পড় দিয়ে দাঁত সব কয়টা ফেলে দেব। বদের বদ।

জরিনা বেগম আনন্দে হেসে ফেলল। খসরু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হিমু ভাইজান, আমারে কী যে বিপদে ফেলছেন! যাই হোক, হিমু ভাইজানের কথার উপরে কারোর কোনো কথা নাই। কাইল হারামজাদাটারে ইস্কুলে দিয়া দিব।

ফেরার পথে মনে হলো, কাছেই তো র‍্যাবের অফিস। এসেছি যখন দেখা করে যাই। পরিচিতজনরা আছেন—

ঘামবাবু

হামবাবু

মধ্যমণি

হামবাবুর খোঁজটাও নেয়া দরকার। জ্ঞান কি ফিরেছে? এখনো না ফিরলে একবার দেখা করে আসা প্রয়োজন। সামাজিক সৌজন্য সাক্ষাৎ।

মধ্যমণি অফিসেই ছিলেন। তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন যেন আমাকে চিনতে পারছেন না।

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার কি আমাকে চিনেছেন?

তোমাকে চেনাটা কি জরুরি?

আমাকে চেনা জরুরি না স্যার। নিজেকে চেনা জরুরি। এইজন্যেই বারবার বলা হয়েছে— Know thyself.

তুমি কী চাও?

আমি কিছুই চাই না। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই। আচ্ছা স্যার, মুরগি ছাদেককে কি ভাত খাওয়ানো হয়েছিল? হারুন-আল-রশিদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি বলতে পারলেন না।

মধ্যমণি থমথমে গলায় বললেন, হারুনকে চেন?

কেন চিনব না! গতকাল দুপুরেই একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছি। তারপর উনাকে পাঠিয়ে দিলাম আমার ঘরে ঘুমানোর জন্য। আমি ফ্লাস্ক নিয়ে বের হয়ে পড়লাম।

তোমার ঘরে ঘুমানোর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছ তার মানে কী?

হেভি খাওয়া দাওয়ার পর একটু গড়াগড়ি দিতে পারলে ভালো লাগে। জর্দা দিয়ে এক খিলি পান, একটা সিগারেট। স্বর্গসুখ।

মধ্যমণি সিগারেট ধরালেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে। চিন্তিত চেহারা। তিনি টেলিফোনে নিচু গলায় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললেন। মনে হচ্ছে হারুন-আল-রশিদের খোঁজখবর নিলেন। তাঁর মুখের চিন্তিত ভাব আরো বাড়ল।

হারুন তোমার ঘরে ঘুমাচ্ছে এই খবর দেয়ার জন্যে তুমি এসেছ?

আমি গতকালের কথা বলছি। তবে আজ রাতে আমার সঙ্গে থাকতেও পারেন। উনাকে কি কিছু বলতে হবে?

যা বলার আমরাই বলব। তোমাকে কিছু বলতে হবে না। এখন বিদায় হও।

আমার বইটা কি পাওয়া যাবে স্যার?

কী বই?

চেঙ্গিস খান। আপনার হাতে ছিল। আপনি পাতা উল্টাচ্ছিলেন।

ও আচ্ছা। বই তোমাকে দেয়া হয় নি?

জি-না।

বোস, বই ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

স্যার, একটা সিগারেট কি খেতে পারি? আপনি যদি বেয়াদবি না নেন।

নো সিগারেট।

জি আচ্ছা।

বই খোঁজা হচ্ছে। টেবিল, ড্রয়ার। টেবিলের সাইড বক্স। কিছু ফাইলপত্রও খোলা হলো। যদি ফাইলের ভেতর ঢুকে যায়। চেঙ্গিস খান সাহেবকে পাওয়া গেল না।

আমরা খুঁজে রাখব। তুমি পরে একসময় এসে নিয়ে যাবে।

জি আচ্ছা। হামবাবুর অবস্থা কী স্যার?

হামবাবুটা কে?

আমাকে ইন্টারোগেশনের সময় আপনার ডানপাশে বসেছিলেন। আমাকে চড় মারতে গিয়ে পড়ে গিয়ে মাথায় ব্যথা পেলেন।

ও আচ্ছা। সফিক। আগের মতোই আছে। সেন্স ফিরে নি।

কোথায় আছেন, কী সমাচার, জানতে পারলে একবার দেখা করে আসতাম।

তোমার দেখা করার প্রয়োজন নেই। তার প্রপার চিকিৎসা হচ্ছে। তাকে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটাল।

আমি বললাম, সামান্য চড়ের জন্য কী হয়ে গেল, স্যার একটু দেখেন। তাও বেচারা চড়টা দিতে পারে নি। চড়টা দিলে কিছু শান্তির ব্যাপার ছিল। কী বলেন স্যার?

রসিকতার চেষ্টা করবে না। Get lost.

আমি বের হয়ে এলাম।

বড় খালু সাহেবের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠি ডাকে আসে নি। হাতে হাতে এসেছে। সীল গালা করা খাম দরজার নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। খামের উপরে লাল কালি দিয়ে লেখা— 'আর্জেন্ট'। চিঠি বাংলা ইংরেজি দুই ভাষার জগাখিচুড়ি। খালু সাহেব যদি জাপানি ভাষা জানতেন তাহলে সেই ভাষাও চিঠিতে ঢুকে পড়তো বলে আমার ধারণা।

Dear হিমু,

বিরাট বিপদে পড়েছি। In deep trouble. চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে আছি। Drowning. ডুবে যাচ্ছি।

মনে হচ্ছে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। আমি বিরাট অভাগা। অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়— Mighty ocean dries out.

হিমু, তুমি আমাকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে কি-না জানি না। মনে হয় না পারবে। কেউ পারবে না।

I am in love
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE

সাক্ষাতে কথা হবে।

তোমার বড় খালু

পুনশ্চ-১ : তোমার খালা যেন এই চিঠির বিষয়ে কিছু না জানে।

পুনশ্চ-২ : আমার সঙ্গে কথা না বলে তুমি খালার সঙ্গে দেখা করবে না।

পুনশ্চ-৩ : তোমাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি।

পুনশ্চ-৪ : PLEASE HELP ME AND PRAY FOR ME.

পুনশ্চ-৫ : Oh God, help me.

পুনশ্চ-৬ : মেয়েটার নাম ফ্লাওয়ার।

পুনশ্চ-৭ : ফ্লাওয়ারকে চিনেছ? একদিন তোমাকে তার কথা বলেছিলাম।

এমন একটা চিঠি হাতে আসার পর দেরি করা যায় না। আমি খালু সাহেবের অফিসে চলে গেলাম।

খালু সাহেব বললেন, বাসায় না এসে অফিসে এসে ভালো করেছ।

আমি বললাম, খালু সাহেব, আপনার চেহারা টেহারা তো খারাপ হয়ে গেছে।

রাতে ঘুম হয় না। চেহারা তো খারাপ হবেই। তোমার খালাও মনে হয় কিছু সন্দেহ টন্দেহ করে। কেমন করে যেন তাকায়। আমার পেছনে স্পাই লাগিয়েছে কি-না কে জানে!

আমি বললাম, লাগাতে পারে। স্পাই হয়তো ইতিমধ্যেই আড়াল থেকে আপনাদের ছবি টবি তুলেছে।

খালু সাহেব বললেন, তুলুক। যা ইচ্ছা করুক। আমি পৃথিবীর কোনো কিছুকেই কেয়ার করি না। এখন তুমি বলো, তুমি কি আমার হয়ে কাজ করবে?

অবশ্যই করব।

ওয়ার্ড অব অনার।

ওয়ার্ড অব অনার। এখন বলেন আমাকে কী করতে হবে?

আপাতত তোমাকে কিছু করতে হবে না। আপাতত আমি তোমার সাপোর্ট চাই। আর কিছু চাই না।

ফ্লাওয়ার মেয়েটা কি জানে আপনি তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন?

জানে না।

সে কি আপনাকে বিয়ে করতে চায়?

সেটা জানি না। একদিন সে আমাকে তার বাসায় দাওয়াত করেছে। লাউপাতা দিয়ে একটা ইলিশ মাছের রান্না সে না-কি খুব ভালো জানে।

বাসায় যাওয়া কি ঠিক হবে ?

কেন ঠিক হবে না ? অবশ্যই ঠিক হবে। হিমু শোন, এই মেয়েটার সব কিছুই সুন্দর। সামান্য চিনাবাদাম খাবার মধ্যেও তার একটা আর্ট আছে। আস্তে করে খোসা ভাঙল। তারপর বাদামে কুট কুট কামড়।

বড় খালা বাদাম কীভাবে খায় ?

ওর কথা বাদ দাও। সাত আটটা বাদাম একসঙ্গে মুখে দিয়ে কচকচ করে চাবায়। Ugly. হিমু, চা খাবে ?

খাব।

তোমার সাপোর্ট আছে তো ?

অবশ্যই।

তোমার খালাকে রাজি করানো বিরাট সমস্যা হবে। সে আমাকে ডিভোর্সও দিবে না, ঐ মেয়েকে বিয়ের অনুমতিও দিবে না। আমি মরার আগপর্যন্ত আমার ঘাড় ধরে ঝুলে থাকবে। Ugly.

খালু সাহেব, আপনি একেবারেই চিন্তা করবেন না, খালার ব্যবস্থা করা হবে।

কী ব্যবস্থা করবে ?

কোনো ওষুধেই যদি কাজ না হয় তাহলে ক্রসফায়ার। র‍্যাব ভাইরা আছে কী জন্যে ? শাশ্বত প্রেমের জন্যে তারা এই সামান্য কাজটা করবে না ? কবি বলেছেন—

হুয়া হ্যায় পাও হি পাহেলি
না বুর্দে এশক মে জখমি
না ভাগা যায়ে যায় মুজসে
না তেহারা চায় হায় মুজসে

খালু সাহেব বললেন, এই কবিতার মানে কী ?

মানে হচ্ছে, প্রেমের যুদ্ধে প্রথম আহত হয়েছে পা। না পারি ভাগতে। থাকাও যে যায় না।

কার লেখা ?

মীর্জা গালিব।

কবিতাটা লিখে দাও। এই জাতীয় আরো কবিতা কি জানা আছে ?

আমি চা খেলাম। স্যান্ডউইচ খেলাম। মীর্জা গালিবের তিনটা কবিতা লিখে খালু সাহেবের টেবিলে কাচের নিচে রেখে সোজা বড় খালার ফ্ল্যাট বাড়িতে উপস্থিত হলাম। আমি দুই পার্টির হয়েই কাজ করছি। আমার দায়িত্ব সামান্য না। দু'জনকেই জিতিয়ে দিতে হবে। সহজ কাজ না।

মাজেদা খালার ফ্ল্যাটে ধুন্ধুমার কাণ্ড। বসার ঘরে সোফায় মূর্তির মতো তিনি বসে আছেন। তাঁর হাতে একটা বই। বইয়ে অ্যারোপ্লেনের ছবি। ছবির নিচে লেখা—

CHINA ENGLISH
DICTIONARY

ডিকশনারির সাথে অ্যারোপ্লেনের সম্পর্ক ঠিক বোঝা গেল না।

বড়খালার সামনে বিশাল সাইজের এক গামলা। তিনি গামলায় দু'পা ডুবিয়ে বসে আছেন। গামলাভর্তি কুচকুচে কালো রঙের তরল পদার্থ। গামলার সামনে নাক চ্যাপ্টা এক বিদেশিনী। বিদেশিনীর হাতে স্পঞ্জ। সে কালো তরল পদার্থে হাত ডুবিয়ে স্পঞ্জ দিয়ে কী যেন করছে। আমি বললাম, হচ্ছে কী ?

মাজেদা খালা বললেন, ফুট ম্যাসাজ নিচ্ছি। এই মেয়ের নাম হু-সি। হংকং-এর মেয়ে। ধানমণ্ডিতে নতুন একটা পার্লার হয়েছে। সেখান থেকে খবর দিয়ে এনেছি। গাধাটাইপ মেয়ে। ছয় মাস হয়ে গেছে বাংলাদেশে আছে, একটা মাত্র বাংলা শব্দ শিখেছে— সালেম আলেম।

সালেম আলেম মানে কী ?

সালেম আলেম মানে স্লামালিকুম।

হু-সি আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, সালেম আলেম।

আমি বললাম, তোমাকেও সালেম আলেম।

মাজেদা খালা বললেন, চায়না ইংলিশ ডিকশনারি এই গাধা মেয়েটা নিয়ে এসেছে। যাতে আমি তার সঙ্গে আলাপ টালাপ করতে পারি। এতক্ষণ ডিকশনারি ঘেঁটে এমন কিছু পেলাম না যা হু-সি'কে বলা যায়। তুই দেখ তো কিছু পাস কি-না।

আমি ডিকশনারি ঘেঁটে কয়েকটা বাক্য বের করলাম। যেমন, মাং মা ? তুমি কি ব্যস্ত ?

মাং মা বলতেই মেয়েটা ঘনঘন মাথা নাড়তে লাগল। বোঝা গেল সে ব্যস্ত।

সেন টি জেন মে ইয়াং ? তোমার শরীর কেমন ?

মেয়েটি মুখভর্তি করে হাসল। মনে হচ্ছে তার শরীর ভালো।

নি হাই মা? কেমন আছ?

এবার হাসি আরো বেশি। সে যে ভালো এ বিষয়ে এখন পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া গেল।

বড়খালা বললেন, বই ঘেঁটে দেখ তো 'এক কাপ চা খাবেন' এই কথাটা আছে কি-না! মেয়েটাকে এক কাপ চা খাওয়াতাম। কী সুন্দর গায়ের রঙ দেখেছিস!

হুঁ।

দুধে আলতা না?

আমি খালার পাশে বসতে বসতে বললাম, দুধে আলতা শব্দটা ভুল। দুধের মধ্যে আলতা দিয়ে দেখ, দুধ সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে ছানা ছানা হয়ে যায়। কুৎসিত একটা পদার্থ তৈরি হয়। এই মেয়ে কুৎসিত না।

কুৎসিত কী বলছিস! পরীর মতো মেয়ে। স্বভাব চরিত্রও ভালো। সারাক্ষণ হাসছে। ডিকশনারি দেখে জিজ্ঞেস কর তো, মেয়েটা আনম্যারিড কি-না?

আনম্যারিড হলে কী করবে?

বিয়ে দেবার চেষ্টা করব। সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে দেয়ার মধ্যে আনন্দ আছে। মেয়েটার আঙুলের দিকে তাকিয়ে দেখ, একেই বোধহয় বলে চম্পক আঙুলি। হাতের তালুর তুলনায় আঙুল কিন্তু যথেষ্ট লম্বা। ঠিক না?

হ্যাঁ ঠিক।

মাজেদা খালা হঠাৎ ফিসফিস করে বললেন, অ্যাই হিমু, তুই মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেল না।

আমি?

সারাদিন তুই হাঁটাহাঁটি করবি, সন্ধ্যাবেলা এই মেয়ে তোর ফুট ম্যাসাজ করে দেবে।

বুদ্ধি খারাপ না। বড়খালা শোন— পাওয়া গেছে।

কী পাওয়া গেছে?

চা খাওয়ার ব্যাপারটা পাওয়া গেছে। একটু অন্যভাবে পাওয়া গেছে।

অন্যভাবে মানে?

আমাকে এককাপ চা দাও— এইভাবে আছে। বলে দেখব? বুদ্ধিমতী মেয়ে হলে অর্থ বের করে ফেলবে।

বলে দেখ।

আমি হু-সি'র দিকে তাকিয়ে গলা যথাসম্ভব চাইনিজদের মতো করে বললাম, কিং হে বেই ছা?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, অ্যাপ্রনে হাত মুছে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। আমি এবং মাজেদা খালা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি। দেখি এই মেয়ে কী করে? সে চুলা ধরিয়ে কেতলি বসিয়ে দিল। মনে হচ্ছে আমাদের জন্যে চা বানাচ্ছে।

মাজেদা খালা মুগ্ধ গলায় বললেন, কীরকম ভালো মেয়ে দেখেছিস? অসাধারণ। আমি ঠাট্টা করছি না, এরকম একটা মেয়েই তোর জন্যে দরকার।

চাইনিজ ভাষায় এই মেয়ের সঙ্গে প্রেম করব কীভাবে?

চাইনিজ শিখে নিবি। সামান্য একটা ভাষা শিখতে পারবি না?

সাপ ব্যাঙ রান্না করে বসে থাকবে— এটা একটা সমস্যা না?

সাপ ব্যাঙ রাঁধবে কেন? তুই যা রাঁধতে বলবি তাই রাঁধবে। বাঙালি রান্না শিখে নিবে।

বেচারিরও তো মাঝে মধ্যে সাপ টিকটিকি খেতে ইচ্ছা হতে পারে।

তখন সে আলাদা রান্না করে খাবে।

যে চামচ দিয়ে সে সাপের ঝোল নাড়াচাড়া করল, দেখা গেল সেই একই চামচ দিয়ে সে মটরশুটি কই মাছ নাড়াচাড়া করছে। তখন?

বড়খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ফালতু ব্যাপার নিয়ে তুই কথা বলিস। তোর প্রধান সমস্যা— 'ফালতু'। এখন তোর খালু সাহেবের ব্যাপারটা বল। গোপন কথা সেরে নেই। চাইনিজ মেয়েটাও নেই।

থাকলেও তো সমস্যা নেই। সে তো বাংলা বোঝে না।

তা ঠিক। তারপরেও লজ্জা লজ্জা লাগে। দেখি ছবি কেমন তুলেছিস।

আমি মোবাইল টেলিফোন কাম ভিডিও যন্ত্র খালার হাতে দিলাম। খালা চাপা গলায় বললেন, এই সেই হারামজাদি?

হুঁ।

বাদাম খাচ্ছে?

হুঁ।

তোর খালু এই মেয়ের মধ্যে কী দেখেছে?

মেয়েটা খুব সুন্দর করে বাদাম খেতে পারে। একটা একটা করে মুখে দেয় আর কুটকুট করে খায়।

তোকে কে বলেছে ?

খালু সাহেব নিজেই বলেছেন।

আর কী বলেছে ?

মেয়েটা খালু সাহেবকে একদিন বাসায় দাওয়াত করেছে।

বলিস কী!

আর দেরি করা ঠিক হবে না, অ্যাকশানে চলে যেতে হবে।

কী অ্যাকশানে যাবি ?

কাজি ডেকে দুইজনকে বিয়ে করিয়ে দেই। ঝামেলা শেষ। দুইজন বসে বাদাম খাক।

বড়খালা আগুনচোখে তাকিয়ে আছেন। যে-কোনো সময় বিস্ফোরণ হবে এমন অবস্থা। বিস্ফোরণের এক দুই সেকেন্ড আগে নিজেকে সামলালেন। হু-সি চা ট্রে'তে করে দুই কাপ চা নিয়ে এসেছে। ট্রে হাতে মাথা নিচু করে বো করল। হাতের ইশারায় বুঝালো, সে চা খায় না। খালা বিড়বিড় করে বললেন, মেয়েটার আদব-কায়দা যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি।

আমরা নিঃশব্দে চা খেলাম। হু-সি ম্যাসাজে লেগে গেল। পা টিপাটিপির যে এত কায়দাকানুন আমি জানতাম না। মুগ্ধ হয়ে দেখছি।

মাজেদা খালা বললেন, তোর খালু সাহেবকে টাইট দেবার একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। একদিন আমি পার্কে চলে যাব। রাধা-কৃষ্ণকে হাতেনাতে ধরব। সঙ্গে ঝাড়ু নিয়ে যাব। ঝাড়ুপেটা করতে করতে কৃষ্ণকে বাড়িতে আনব।

আমি বললাম, বুদ্ধি খারাপ না।

তুইও আমার সঙ্গে থাকবি।

আমি কী করব ?

ঝাড়ুপেটার দৃশ্য ভিডিও করবি। প্রতি রাতে ঘুমাতে যাবার আগে তোর খালু সাহেবকে এই ভিডিও দেখতে হবে। এটাই তার শাস্তি।

তাহলে আরেকটা কাজ করা যাক। প্রফেশনাল ভিডিওম্যান নিয়ে আসি। এরা ক্যামেরা, বুম, রিফ্লেকটর বোর্ড নিয়ে আড়ালে অপেক্ষা করবে। যেই মুহূর্তে তুমি ঝাড়ু নিয়ে অ্যাকশানে যাবে ওমনি ক্যামেরাও অ্যাকশানে যাবে।

বড়খালা বললেন, তুই কি ঠাট্টা করছিস, না সিরিয়াসলি বলছিস ?

সিরিয়াসলি বলছি।

ক্যামেরা ভাড়া করতে কত লাগবে ?

জানি না কত লাগবে। তুমি বললে খোঁজ করি।

ঠিক আছে খোঁজ কর।

আমি বললাম, ভিডিওটা যদি ভালো হয় তাহলে সিডিতে বেশ কিছু কপি ট্রান্সফার করে নেব। তুমি কিছু নিজের কাছে রাখলে, আত্মীয়স্বজনকে বিলি করলে। আমরা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দিয়ে দেখতে পারি। কেউ যদি চালায় তাহলে কিছু টাকা পাব। অনেকগুলি চ্যানেল হয়েছে তো— তারা প্রোগ্রাম পাচ্ছে না। যে যা-ই বানাচ্ছে কিনে নিচ্ছে। কিছুদিন আগে একটা চ্যানেলে চল্লিশ মিনিটের জন্মদিনের একটা প্রোগ্রাম দেখিয়েছে। শিরোনাম হলো— 'একটি সাধারণ জন্মদিন উৎসব'। আমাদের ভিডিওটার শিরোনাম হবে—

পরকীয়ার পরিণতি

ঝাড়ু ট্রিটমেন্ট

বড়খালা থমথমে গলায় বললেন, হিমু, তোর সবকিছুই ফাজলামি। সবই রসিকতা। তুই এক্ষুনি এই বাড়ি থেকে চলে যাবি। আর কখনো আসবি না।

ভিডিওর ব্যবস্থা করব না ?

তোকে কিছুই করতে হবে না। বের হয়ে যা। যা বললাম।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে চাইনিজদের মতো বো করে চাইনিজ ভাষায় বললাম, জিয়ে জিয়ে নিন জিয়ান সেং ঝু নিন সুন লি। যার বাংলা অর্থ— ধন্যবাদ, আপনার দিন শুভ হোক।

বড়খালা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। হু-সি খিলখিল করে হাসছে। মেয়েটার হাসি সুন্দর। মনে হচ্ছে, একসঙ্গে অনেকগুলি কাচের চুড়ি বেজে উঠল।

বড়খালার ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনে সবে ধরিয়েছি, দেখা গেল, হু-সি অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের গেট দিয়ে বের হচ্ছে। তার হাতে পেটমোটা এক ব্যাগ। চোখে কালো চশমা। কালো চশমা পরা মানুষজন কোন দিকে তাকাচ্ছে বোঝা যায় না। সে যে আমাকেই দেখছে, আমার দিকেই এগিয়ে আসছে এটা বুঝতে সময় লাগল।

হু-সি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে চোখের কালো চশমা নামাল। আমাকে অবাক করে দিয়ে মোটামুটি শুদ্ধ বাংলায় বলল, আমি বাংলা ভালো বলতে পারি। বাংলা জানি না বললে আমার সুবিধা হয়, এইজন্যে মিথ্যা বলি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। জিয়ে জিয়ে নিন জিয়ান সেং ঝু নিন সুন লি।

সে মাথা নিচু করে বো করল।

তার পেটমোটা ব্যাগের পকেট থেকে কয়েকটা লজেন্স বের করল। আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, তোমার জন্য সামান্য উপহার।

আমি উপহার নিতে নিতে বললাম, চাইনিজ ভাষায় ধন্যবাদ যেন কী ?

জিয়ে জিয়ে নি।

আমি লজেন্স পকেটে ভরতে ভরতে বললাম, জিয়ে জিয়ে নি।

সে আমার দিকে চায়না ইংলিশ ডিকশনারিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, You keep it.

এই মেয়ে শুধু যে বাংলাই জানে তা-না, ইংরেজিও জানে।

আমার ঘরের ভেতরের একটি দৃশ্য।

সময় দুপুর। কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে। কোকিলের ডাকের কথায় ভেবে বসা ঠিক না যে, এখন বসন্তকাল। ঢাকা শহরের কোকিলরা কিছুটা বিভ্রান্ত। পৌষ মাসেও তাদের ডাক শোনা যায়।

আজ জানুয়ারির তিন তারিখ। মাঘ মাস। মাঘ মাসের শীতে কোনো এক সময় হয়তো বাংলার বাঘরা পালিয়ে যেত। এখন অবস্থা ভিন্ন। গরমে বাঘরা অতিষ্ঠ।

ঘরের ভেতরে যথেষ্ট গরম। মাথার উপর ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরছে। বিছানায় খালি গায়ে হারুন-আল-রশিদ ঘুমাচ্ছে। তার দুপুরের খাবার ব্যবস্থা মেসে করে দিয়েছি। মেসে যে সব আইটেম রান্না হয় তাতে তার পেট ভরে না বলে বিছমিল্লাহ হোটেল থেকেও প্রতিদিনই দু'একটা আইটেম আসে। মেসের বাবুর্চি আলাদা করে দু'টা ডিম পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে মেখে দেয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর হারুন-আল-রশিদ টানা ঘুম দেয়। ঘুম ভাঙে সন্ধ্যার আগে আগে। অতি নিরীহ নির্বিরোধী ভালো মানুষ। খাদ্যদ্রব্যের বাইরের কোনো বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ নেই। পুরনো ঢাকার কোন দোকানে আসল কাচ্চি পাওয়া যায়, কোন দোকানে গ্লাসি নামের খাসির মাংসের বিশেষ পদ পাওয়া যায়— সব তাঁর মুখস্থ। সে আমাকে কথা দিয়েছে কাজের চাপ একটু কমলেই গ্লাসি এনে খাওয়াবে। এটা এমনই এক খাদ্যবস্তু যে, একবার খেলে ঠোঁটে ঘিয়ের গন্ধ লেগে থাকবে তিনদিন।

আমি চেয়ারে বসে ঘুমন্ত হারুন-আল-রশিদকে দেখছি এবং বেচারার প্রচণ্ড কাজের চাপ দেখে সহানুভূতি বোধ করছি, এমন সময় মেসের ম্যানেজার জয়নাল এসে ঢুকল। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, সর্বনাশ হয়েছে। পালিয়ে যাবেন কি-না বিবেচনা করেন। হাতে সময় নাই।

একজন ফিসফিস করে কথা বললে অন্যজনকেও ফিসফিস করতে হয়। আমিও ফিসফিস করে বললাম, পালিয়ে যাবার মতো অবস্থা ?

অবশ্যই! আপনার খোঁজে র‍্যাব এসেছে। জিপভর্তি র‍্যাব। আমাকে আপনার কথা জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, খোঁজ নিয়া আসি আছে কি-না। সম্ভবত নাই। এই সময় সাধারণত উনি থাকেন না। সত্যও বলি নাই মিথ্যাও বলি নাই। মাঝামাঝি বলেছি।

ভালো করেছেন।

হিমু ভাই, সময় নষ্ট করবেন না। সিঁড়ি দিয়ে ছাদে চলে যান। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদে যাবেন। পারবেন না?

অসম্ভব। এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফালাফি আমাকে দিয়ে হবে না। ধরা দেওয়া ছাড়া উপায় দেখি না।

ধরা দিবেন?

উপায় কী? অপরাধ তো কিছু করি নাই।

র‍্যাব অপরাধ করেছেন কি করেন নাই এইসব বিবেচনা করবে না। ধরা খাওয়া মানে ঢিসুম ঢিসুম। ক্রসফায়ার। আল্লাহখোদার নাম নেন হিমু ভাই। দোয়া ইউনুস পড়তে পড়তে যান।

ম্যানেজারের কথা শেষ হলো না, বারান্দায় বুটের শব্দ পাওয়া গেল। ম্যানেজার জয়নাল হতাশ গলায় বলল, হিমু ভাই, আর সময় নাই। চলে আসছে। জানালা দিয়ে লাফ দিবেন কি-না বিবেচনা করেন।

বিবেচনার আগেই যিনি ঢুকলেন তাকে আমি চিনি। তিনি আমাদের পরিচিত ঘামবাবু। ম্যানেজার জয়নাল তাঁর দিকে তাকিয়ে সব কয়টা দাঁত বের করে বলল, স্যার, হিমু ভাই ঘরেই আছেন। বাথরুমে ছিলেন বলে আপনাদের আসার সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারি নাই। অপরাধ ক্ষমা করবেন।

ঘামবাবু কঠিন গলায় বললেন, আপনি আপনার কাজে যান।

ম্যানেজার বলল, অবশ্যই। অবশ্যই। স্যার স্লামালাইকুম।

ঘামবাবু সালামের জবাব দিলেন না। তিনি মহাক্ষিপ্ত এবং মহাবিরক্ত। তিনি হারুন-আল-রশিদের দিকে ব্যাটন উঁচিয়ে বললেন, এ এখানে ঘুমাচ্ছে কেন?

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার, উনার নাম হারুন-আল-রশিদ। বিখ্যাত ব্যক্তি, বাগদাদের খলিফা ছিলেন।

ঘামবাবু বললেন, একে আমি জানি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এ এখানে ঘুমাচ্ছে কেন?

আমি বললাম, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর উনি সামান্য রেস্ট নেন।

কবে থেকে রেস্ট নেয়?

প্রথমদিন থেকেই। আপনাদের আগে একবার বলেছিলাম। মনে হয় ভুলে গেছেন।

খাওয়া-দাওয়া কোথায় করে?

আমার সঙ্গেই করে। আমরা মেসে খাই। দুই একটা আইটেম বিছমিল্লাহ হোটেল থেকে নিয়ে আসি। ওদের মুড়িঘণ্ট অসাধারণ। আপনার দাওয়াত রইল, একদিন দুপুরে যদি আসেন খুবই খুশি হবো।

ঘামবাবু এমন কঠিন চোখে তাকালেন যে, আমাকে চুপ হয়ে যেতে হলো। ঘরে শ্মশান নীরবতা। শুধু হারুন-আল-রশিদ মিহিভাবে নাক ডেকে যাচ্ছেন। আমি বললাম, স্যার, বটুভাইকে ডেকে তুলব?

বটু কে?

হারুন ভাইয়ের ডাকনাম বটু।

ঘামবাবু বিড়বিড় করে বললেন, আরাম করে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে In your own bed. আমি আমার জীবনে এরচে' বিস্ময়কর কোনো ঘটনা দেখি নি।

আমি বললাম, স্যার ক্রসফায়ারে লোকজন যখন মারা যায় সেই ঘটনা আপনার কাছে তেমন বিস্ময়কর লাগে না?

ঘামবাবুর কুঁচকানো ভুরু আরো কুঁচকে গেল। তিনি খসখসে গলায় বললেন, আমার সঙ্গে চলুন।

কোথায় যাব স্যার?

হেড অফিসে।

চলুন যাই। একতলায় দু'মিনিট সময় দেবেন, ম্যানেজার জয়নালকে দু'টা কথা বলে যাব।

মেসের সামনে র‍্যাবের জিপ গাড়ি। জিপ গাড়ির রঙও কালো। কালো একটা গাড়িতে কালো পোশাক পরে একদল লোক বসে আছে। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও কালো। এই দৃশ্য একবার দেখলে তারাশংকরের কবি কখনো বলত না—

কালো যদি মন্দ হবে গো
কেশ পাকিলে কান্দ কেন?

গাড়ির আশেপাশে একদল কৌতূহলী মানুষ। তারা কৌতূহলী কিন্তু ভীত। কোন অভাগাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেটা দেখার আগ্রহ আছে। দেখতে গিয়ে কোন ঝামেলায় পড়ে সেই সংশয়ও আছে।

ম্যানেজার জয়নাল কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, একমনে দোয়া ইউনুস পড়তে পড়তে যান। আল্লাহর হাতে সোপর্দ। আমি খতমে জালালি পাঠের ব্যবস্থা করতেছি।

আমি বললাম, আমার ঘরে যে শুয়ে আছে তাকে কোনোকিছু বলার দরকার নেই।

জয়নাল বলল, কিছু বলব না। আমার মুখে সিলাই। হিমু ভাই, আপনি দোয়া ইউনুস পড়তে ভুলবেন না। গরিবের এই দোয়া ছাড়া গতি নাই।

আমি অনেক কৌতূহলী চোখের উপর দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। আশ্চর্য কাণ্ড, গাড়ির ভেতরে ক্যাসেট প্লেয়ারে নজরুল গীতি বাজছে। উস্তর অঞ্জলী মুখার্জির কিন্নর কণ্ঠ— 'ওগো মদিনাবাসী প্রেমে ধর হাত মম'।

আবার আগের ব্যবস্থা। সেই ইন্টারোগেশন রুম। তিনজনের জায়গায় দু'জন। ঘামবাবু এবং মধ্যমণি। শুধু হামবাবু নেই। তবে আজকের পরিস্থিতি মনে হয় সামান্য ভালো। আমার সামনে এককাপ চা রাখা হয়েছে। অন্য একটা প্লেটে বিসকিট আছে। ঘামবাবু বিসকিটের প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, চা খাও।

আমি চায়ে বিসকিট ডুবিয়ে খেতে শুরু করেছি। এই আধুনিক সময়ে চায়ে বিসকিট ডুবিয়ে খাওয়াকে অভদ্রতা গণ্য করা হয়। বিসকিট মাঝে মাঝে গলে কাপে পড়ে যায়। সেই গলন্ত বিসকিট আঙুল দিয়ে তুলে মুখে দেওয়াকে চূড়ান্ত অশ্লীলতা মনে করা হয়। এই কাজটি কেউ করলে আশেপাশের সবার সুরুচি এতই আহত হয় যে, তারা প্রায় শিউরে উঠেন। আমি এই কাজটিই হাসিমুখে করছি। দু'টা বিসকিট এই ভঙ্গিতে খাওয়ার পর তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললাম, জিয়ে জিয়ে নি। জিয়ে জিয়ে নি।

মধ্যমণি বললেন, তার মানে?

আমি বললাম, স্যার চাইনিজ ভাষায় বলেছি, আপনাকে ধন্যবাদ। জিয়ে জিয়ে নি'র মানে ধন্যবাদ। আমি অভদ্রের মতো আপনাদের সামনে চা বিসকিট খেলাম— মেই গুয়া জি। মেই গুয়া জি'র অর্থ, মনে কিছু করবেন না।

মধ্যমণি বললেন, চাইনিজ ভাষায় কথা বলার প্রয়োজন দেখছি না। বাংলা ভাষায় কথাবার্তা হোক। বাংলায় কথা বলতে তোমার যদি অসুবিধা না হয়।

আমি বললাম, বিকে কি, অর্থাৎ ঠিক আছে।

মধ্যমণি আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তোমার পাসপোর্ট আছে?

জি-না স্যার। পাসপোর্ট দিয়ে আমি কী করব?

আমি চব্বিশ ঘণ্টায় তোমার একটা পাসপোর্ট করিয়ে দিচ্ছি।

আমি আনন্দিত হবার ভঙ্গি করে বললাম, জিয়ে জিয়ে নি। আপনাকে ধন্যবাদ।

তোমার ভিসার ব্যবস্থা করে দেব। তুমি পরশু চলে যাবে।

জি আচ্ছা।

কোথায় যাবে জানতে চাইলে না?

কোথায় যেতে হবে আমি জানি।

তোমার জানার কথা না।

কথা না থাকলেও কেউ কেউ অগ্রিম জেনে ফেলে। একজন সন্ত্রাসী যখন ধরা পড়ে সে কিন্তু জানে না কখন সে মারা যাবে। আপনারা জানেন।

মধ্যমণি বললেন, অতিরিক্ত স্মার্ট হবার চেষ্টা করবে না।

আচ্ছা স্যার করব না।

তোমাকে কোথায় পাঠাতে চাচ্ছি বলে তোমার ধারণা?

মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটাল, সিঙ্গাপুর। হামবাবুর আত্মীয়স্বজনদের ধারণা হয়েছে যেহেতু আমাকে চড় মারতে গিয়ে উনার এই অবস্থা, এখন একমাত্র আমিই পারি উনার ঘুম ভাঙাতে। তার ছেলে আমাকে তার বাবার পাশে উপস্থিত করাবার জন্য অতি ব্যস্ত। এর মধ্যে আপনারাও আমার বিষয়ে কিছু খোঁজখবর করেছেন। আপনাদের ধারণা হয়েছে, আমি পীর ফকির টাইপের কিছু। আধ্যাত্মিক ক্ষমতা টমতা আছে। আপনারাও কিঞ্চিৎ ভীত। শক্তিধররা ভীতু হয়। কারণ শক্তিধররাই শক্তির ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত। এখন আমি একটা সিগারেট খাব। আমাকে একটা সিগারেট দেবেন?

মধ্যমণি ঘামবাবুর দিকে তাকালেন। চোখে চোখে ইশারা খেলা করল। ঘামবাবু সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার এগিয়ে দিলেন। আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, স্যার, আমার চেঙ্গিস খান বইটা কি পাওয়া গেছে?

পাওয়া যায় নি।

পাওয়া যাবে?

হ্যাঁ যাবে।

মধ্যমণি হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলেন। সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তোমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কি সত্যিই আছে?

কিছুই নাই স্যার। গড অলমাইটি সমস্ত ক্ষমতা তাঁর নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। কাউকেই তিনি কোনো ক্ষমতা দেন না। অনেকেই ভাবে তার ক্ষমতা আছে। এই ভেবে আনন্দ পায়। মিথ্যা আনন্দ।

তোমার কোনো সুপারন্যাচারাল পাওয়ার নেই ?

জি-না।

তাহলে কী করে বললে যে, তোমাকে সিঙ্গাপুর যেতে হবে ? মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটাল।

হামবাবুর ছেলে আমাকে লোক মারফত একটা চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিতে সব জানিয়েছে। চিঠি সঙ্গে আছে। পড়তে চান ?

মধ্যমণি বললেন, চিঠি পড়তে চাই না।

তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি স্বস্তিবোধ করছেন। হিমু নামক লোকটির কোনো ক্ষমতা নেই। সে সাধারণের সাধারণ, তাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাকে চড়-থাপ্পড় দেয়া যেতে পারে। আমি বললাম, স্যার উঠি ?

ঘামবাবু কঠিন ধমক দিলেন, উঠি মানে! ফাজলামি কর ? বসে থাকো।

আমি বসে থাকলাম। আরেকটা বিসকিট খাব কি-না চিন্তা করছি। বিসকিটের চাইনিজ কী ? ঝোলার ভেতর ডিকশনারিটি আছে। চুপচাপ বসে না থেকে কিছু চাইনিজ শব্দ শিখে ফেলা যেতে পারে। ডিকশনারি বের করতে গিয়ে হু-সির উপহার লজেন্সে হাত পড়ল। আমি মধ্যমণির দিকে তাকিয়ে বললাম, লজেন্স খাবেন স্যার ?

উনি জবাব দিলেন না। আমি দু'জনের সামনে দু'টা লজেন্স রেখে ডিকশনারি খুলে বসলাম। চুপচাপ বসে না থেকে জ্ঞানের চর্চা হোক। নবিজী বলেছেন— জ্ঞানের চর্চার জন্যে সুদূর চীন দেশে যাও। আমাকে চীনে যেতে হচ্ছে না। চীন চলে এসেছে আমার হাতে।

সাইকেল	জি জিং ছে
বেবি টেক্সি	সান লুন
বাস	গং গং কি ছে
সাধারণ নৌকা	জিয়াও চুয়ান
যন্ত্রচালিত নৌকা	মো টুয়ো টিং

মধ্যমণি নড়েচড়ে বসলেন। জজ সাহেবদের মতো টেবিলে টোকা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমি বললাম, কিছু বলবেন স্যার ?

পাসপোর্টের জন্যে তোমার ছবি দরকার। ছবি কি আছে, না তুলতে হবে ?

আমি বললাম, পাসপোর্টের প্রয়োজন হবে না স্যার। হামবাবুর জ্ঞান ফিরেছে। উনি সুস্থ। কাল পরশুর ভেতর দেশে ফিরবেন।

তোমাকে কে বলেছে ?

কেউ বলে নাই। এটা আমার অনুমান। আপনারা টেলিফোন করে দেখুন জ্ঞান ফিরেছে কি-না। আমি ততক্ষণে চাইনিজ ভাষা আরো কিছু রপ্ত করি।

মধ্যমণি টেলিফোন সেট হাতে নিলেন।

আমি চোখের সামনে ডিকশনারি মেলে ধরলাম।

গায়ক	গে চাং ইয়ান ইউয়ান
পরিচালক	দাও ইয়ান
অভিনেতা	নান ইয়ান ইউয়ান
অভিনেত্রী	নু ইয়ান ইউয়ান

মধ্যমণির টেলিফোন অনুসন্ধান শেষ হয়েছে। তিনি পরিপূর্ণ বিস্ময় নিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি হাতের ডিকশনারি নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, স্যার, কিছু জানা গেছে ?

মধ্যমণি চাপা গলায় বললেন, মিনিট দশেক আগে জ্ঞান ফিরেছে বলল। সবার সঙ্গে কথা বলেছে। ঠাণ্ডা পানি খেতে চেয়েছে।

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, স্যার, আমি কি এখন উঠতে পারি ?

দু'জনের কেউ কিছু বলল না। তাদের হতভম্ভ ভাব কাটতে সময় লাগবে, এই ফাঁকে কেটে পড়াই ভালো।

'ওগো মদিনাবাসী প্রেমে ধর হাত মম' গুনগুন করে গাইতে গাইতে আমি বের হয়ে গেলাম। র‍্যাব হেড অফিস থেকে এই প্রথম মনে হয় কেউ প্রেমের গান গাইতে গাইতে গাইতে বের হলো। সবাই অবাক হয়ে তাকাচ্ছে।

মেসে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, জয়নাল দৌড়ে এলো। তার চোখে বিস্ময়।

হিমু ভাই, ফিরেছেন ?

হুঁ।

আপনাকে নিয়ে যাওয়ার পর আমি নিজের গালে নিজে তিনটা চড় দিয়েছি।

কেন ?

আমার সঙ্গে জমজমের পানি ছিল। বড়মামা হজ্ব করার সময় নিয়ে এসেছিলেন। আমার উচিত ছিল আপনাকে একগ্লাস জমজমের পানি খাইয়ে দেয়া। যতক্ষণ শরীরে জমজমের পানি থাকে ততক্ষণ অপঘাতে মৃত্যু হয় না। হিমু ভাই, আপনি জীবিত ফিরে এসেছেন। দেখে কী যে আনন্দ হয়েছে। আপনি জীবিত ফিরলে আমি পঞ্চাশ রাকাত নফল নামাজ পড়ব বলে আল্লাহ পাকের কাছে ওয়াদা করছি। এখন নামাজ পড়তে যাব।

খতমে জালালি কি চলছে?

জি, মসজিদে তালেবুল এলেম লাগিয়ে দিয়েছি। আজ সারারাত চলবে।

আমি মনে মনে বললাম, মারহাবা র‍্যাব। মারহাবা।

বালিশের নিচে পাখি ডাকছে। এর মানে কী? ঢাকা শহরের পাখিদের মাথা সামান্য 'আউলা'। তার মানে এই না যে, তাদের কেউ কেউ মানুষের বালিশের নিচে চলে যাবে এবং মনের সুখে ডাকাডাকি করবে। পাখির সন্ধানে বালিশের নিচে হাত বাড়িয়ে যে বস্তু পেলাম, তার নাম মোবাইল টেলিফোন। বড় খালার দেয়া কথোপকথন যন্ত্র। এই যন্ত্রের রিং টোনে আগে বাজনা ছিল, এখন কী করে যেন পাখির ডাক হয়ে গেছে।

হ্যালো বড় খালা!

তুই কি ঘুমাচ্ছিলি নাকি?

হুঁ।

দশটা বাজে, এখনো ঘুমাচ্ছিস?

আমার তো অফিস নেই, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুমাতে পারি।

তাই বলে তোর কোনো টাইমটেবিল থাকবে না? তোকে রিং করেই যাচ্ছি, রিং করেই যাচ্ছি।

কিছু কি ঘটেছে?

ঐ মেয়ে চলে এসেছে।

কোন মেয়ে চলে এসেছে?

হু-সি।

কেন এসেছে?

ও কি বাংলা জানে না-কি যে বলবে কেন এসেছে! কিছুই বলছে না। শুধু হাসছে।

হাবে ভাবেও কিছু বুঝতে পারছ না?

সাথে ব্যাগে করে একগাদা সবজি-টবজি নিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে রান্না করে আমাকে খাওয়াতে চায়। তুই চলে আয়।

আমি চলে আসব কেন? আমাকে তো খাওয়াতে চায় না।

আমার ধারণা তোকেই খাওয়াতে চায়। সে-ই তো তোকে টেলিফোন করতে বলল।

কীভাবে বলল?

ইশারায় কানের কাছে হাত নিয়ে টেলিফোন দেখাল, তারপর বলল, হিমি। ঐ দিন তোকে হিমু হিমু ডাকছিলাম, সে শুনে মনে করে রেখেছে। হিমুটাকে হিমি বানিয়েছে। তুই চলে আয়।

মেনু কী?

মেনু কী তা তো জানি না। ব্যাগ থেকে সব জিনিসপত্র নামায় নি।

সাপখোপ আছে না-কি?

কী যন্ত্রণা! সাপ থাকবে কেন?

সাপ হচ্ছে ওদের ভেরি স্পেশাল ডিশ।

তুই শুধু শুধু কথা লম্বা করছিস, এক্ষুনি চলে আয়।

একটু যে সমস্যা আছে।

কী সমস্যা?

আজ আমার আরেকটা দাওয়াত আছে।

তোকে দাওয়াত করে খাওয়াবে কে?

খালু সাহেব দাওয়াত পেয়েছেন। আমি ফাও হিসেবে সঙ্গে যাচ্ছি।

ফ্লাওয়ারের বাড়িতে দাওয়াত?

হুঁ।

তোর খালু যাচ্ছে?

হুঁ। অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

এতক্ষণে বুঝলাম কেন তোর খালুর সকাল থেকে এত ফটফটানি। আচ্ছা হিমু, দাওয়াতের ঘটনাটা তুই ইন অ্যাডভান্স আমাকে জানাবি না?

জানালাম তো। অ্যাডভান্স জানলে। দাওয়াত দুপুর একটায়, তুমি জেনে গেছ দশটায়। তিন ঘণ্টা আগে। অ্যাকশানে যেতে চাইলে যেতে পার। তিন ঘণ্টা অনেক সময়।

আমি অ্যাকশানে এখন যাব না। তোর খালু দাওয়াত খেয়ে আসুক, তারপর দেখবি অ্যাকশান কাকে বলে। তুই অবশ্যই তোর খালুর সঙ্গে যাবি না। তুই আমার এখানে চলে আসবি। তোর জন্যে একটা চমক আছে।

কী চমক?

আগেভাগে বললে চমক থাকে? এসে দেখে চমকাবি। তবেই না মজা।

মাজেদা খালার গলায় আনন্দ। ফ্লাওয়ারের বিষয়টা তিনি আমলে আনছেন না— এটা বোঝা যাচ্ছে। তিনি আরো মজাদার কিছু নিয়ে ব্যস্ত।

আমি চমকাবার প্রস্তুতি নিয়ে দুপুর একটার দিকে বড় খালার বাসার কলিং বেল টিপলাম। দরজা খুলল হু-সি। বড় খালা হু-সি'কে দিয়েই চমকাবার ব্যবস্থা করেছেন। তাকে বাঙালি মেয়েদের মতো শাড়ি পরিয়ে রেখেছেন। গলায় আবার বেলিফুলের মালা। এই সময় বেলি ফুল পাওয়া যায় না। নকল বেলি ফুলের মালাও হতে পারে।

মাজেদা খালা হাসিমুখে বললেন, চমকেছিস?

হুঁ।

শাড়িতে মেয়েটাকে কী সুন্দর লাগছে দেখেছিস! আমার ইচ্ছা করছে এক্ষুনি কাজি ডেকে মেয়েটার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেই। জোর করে বিয়ে না দিলে তুই বিয়ে করবি না। পথে পথে ঘুরবি।

হুঁ।

তুই শুধু হুঁ হুঁ করছিস কেন? চাইনিজ মেয়ে বিয়ে করতে তোর কি কোনো আপত্তি আছে?

না।

ঐ মেয়ে বাঙালি বিয়ে করতে রাজি আছে কি-না কে জানে! ওকে জিজ্ঞেস করে যে জানব সেই উপায় নেই। এক বর্ণ বাংলা বুঝে না। আমি অবশ্যি বাংলা শেখানো শুরু করেছি। অন্যকে শেখাতে গিয়ে বুঝলাম, বাংলা ভাষা খুবই কঠিন ভাষা। তবে মেয়েটা দ্রুত শিখছে। বুদ্ধিমতী মেয়ে তো!

খালা হাতে একটা কাপ নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে হু-সি'র দিকে তাকালেন, হু-সি বলল, কাপ।

খালার মুখের হাসি অনেকদূর বিস্তৃত হলো। তিনি হাতে পানির গ্লাস নিলেন।

হু-সি বলল, পানি।

খালা গ্লাসে টোকা দিলেন। হুসি বলল, গ্লাস।

এবার খালা নিজের চুলে হাত দিলেন। হু-সি বলল, চুল।

খালা বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন, দেখলি, একদিনে কত কী শিখিয়ে ফেলেছি?

আমি বললাম, তাই তো দেখছি। আচ্ছা খালা, এমন কি হতে পারে যে এই মেয়ে ভালোই বাংলা জানে— আমাদের সঙ্গে ভান করছে যেন কিছুই জানে না।

খালা বিরক্ত মুখে বললেন, তুই সারাজীবন গাধাই থেকে গেলি। তোর জীবনটা গাধামি করতে করতেই কেটে গেল। গাধার গাধা।

দুপুরে আমরা হু-সি'র রান্না করা মাছের আঁশটে গন্ধে ভরপুর কুৎসিত স্যুপ খেলাম। দুর্গন্ধে পাকস্থলি উল্টে আসার মতো হলো। খালা বললেন, বাহ্ স্যুপটা ভালো হয়েছে তো! অরিজিন্যাল চাইনিজ। অরিজিনাল চাইনিজে একটু আঁশটে ভাব থাকে। আঁশটে গন্ধটাই বিশেষত্ব।

স্যুপের পরে মাছের আইটেম। আস্ত ভাজা মাছ। দেখতে লোভনীয়। এক টুকরা মুখে দিয়ে আমি হতভম্ব। মাছ রসগোল্লার চেয়েও দশগুণ মিষ্টি।

মাজেদা খালা বললেন, বাহ্ ভালো তো!

আমি বললাম, তোমার কাছে মিষ্টি লাগছে না?

মধু দিয়ে রান্না করেছে মিষ্টি তো হবেই। এটাই ওদের রান্নার ধারা। একগাদা কাঁচামরিচ, বাটা মরিচ দিয়ে বাঙালি খাবার ওরা কেন রাঁধবে? ওরা রাঁধবে ওদের মতো। তোর স্বভাবই হলো খুঁত ধরা। আরাম করে খা তো।

আমি বললাম, আরাম করে তুমি খাও। বাসি ডাল আছে কি-না দেখ। আমি বাসি ডাল দিয়ে ভাত খাব।

মেয়েটা এত আগ্রহ করে রেঁধেছে! তুই তার সামনে ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে মেয়েটাকে অপমান করবি?

করব। যে জিনিস রেঁধেছে অপমান তার প্রাপ্য।

সত্যি যদি তুই ডাল দিয়ে ভাত খাস তাহলে তুই আর কোনোদিন আমার বাড়িতে ঢুকতে পারবি না। কোনোদিনও না। ঝোল বাদ দিয়ে শুধু মাছটা দিয়ে ভাত খা। মাছের উপরের খোসা ফেলে দে। তাহলে মিষ্টি একটু কম লাগবে।

হু-সি এবং আমি একসঙ্গে ফ্ল্যাট থেকে বের হলাম। খালার দেয়া শাড়ি বদলে নিজের পোশাক পরেছে। নীল রঙের স্কার্ট। এই পোশাকে তাকে শাড়ির চেয়েও মানিয়েছে। আমার ধারণা শাড়িতে শুধু বাঙালি মেয়েদেরকেই ভালো লাগে। এই পোশাক বিদেশিনীদের জন্যে না। খালা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন

আমি যেন ইয়েলো ক্যাবে করে হু-সি'কে তার কাজের জায়গায় নামিয়ে দিয়ে আসি। খালা বলেছেন, আমি চাই তোদের দু'জনে মধ্যে 'ইয়ে' হোক।

আমি বললাম, 'ইয়ে' কী?

বুঝতেই তো পারছিস 'ইয়ে' কী? জেনে শুনে তোর মতো ষাঁড়ের গোবরকে কেউ বিয়ে করবে না। প্রেম হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। প্রেম হয়ে গেলে ষাঁড়ের গোবরও মনে হয় রসগোল্লা।

আমি হু-সি'কে নিয়ে রাস্তায় হাঁটছি, ইয়েলো ক্যাব খুঁজছি। হু-সি বলল, আপনার খাওয়া হয় নি। আমি লজ্জিত।

আমি বললাম, লজ্জিত হবার কিছু নেই। আমি রান্না করলেও তুমি খেতে পারতে না। সবাই সবকিছু পারে না। তুমি পা টিপতে পার। আমি পারি না।

পা টেপাকে আপনারা খারাপ চোখে বিবেচনা করেন?

আমি বললাম, মোটেই না, দাদি নানির পা টেপা আমাদের কালচারের অংশ। তবে বাইরের কেউ এই কাজ করতে পারবে না। যে পা টিপবে তাকে পরিবারের একজন হতে হবে।

হু-সি বলল, আপনার খালার মতো ভালো মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি নাই।

না দেখারই কথা।

হু-সি বলল, আমার প্রতি তাঁর মমতা দেখে আমি খুবই দুঃখ পাই।

কেন?

কারণ আমি ভালো মেয়ে না। আমি খারাপ মেয়ে।

আমি বললাম, যে স্বীকার করতে পারে সে খারাপ সে তত খারাপ না।

হু-সি বলল, ভালো খারাপ নিয়ে কথা বলতে চাই না। আপনি খালি পায়ে হাঁটছেন কেন?

এমনি।

এমনি না। নিশ্চয়ই কারণ আছে। মেইনল্যান্ড চায়নায় কিছু সাধু মানুষ আছেন যারা প্রচণ্ড শীতেও গায়ে হালকা চাদর জড়িয়ে হাঁটেন। তাদেরকে বলা হয় মুসুমি। জাদুকর। আপনি কি জাদুকর?

আমি জাদুকর না।

আপনার খালার ধারণা আমি খুব রূপবতী। আপনার কি মনে হয়?

অবশ্যই তুমি রূপবতী।

আমি এখনো বিয়ে করি নি।

তোমার বিয়ের ফুল ফোটে নি। যেদিন ফুটবে সেদিন তোমার বিয়ে হবে। তার আগে শত চেষ্টা করলেও হবে না।

বিয়ের ফুল কী বুঝিয়ে বলুন।

আমরা মনে করি সব মেয়েদের জন্যে গহীন জঙ্গলে আলাদা আলাদা করে একটি ফুল ফোটে। যেদিন ফুল ফোটে সেদিনই তার বিয়ে হয়। তার আগে না।

যে সব মেয়ের কোনোদিন বিয়ে হয় না তাদের কি কোনো ফুল নেই?

ফুল সবারই আছে। তাদেরটা ফোটে না।

আমি হু-সি'র দিকে তাকালাম। বাঙালি মেয়েদের মতো তার চোখে অশ্রু টলমল করছে। বিয়ের ফুলের কথায় চোখে পানি চলে আসার ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েরা রহস্যময়ী হতে পছন্দ করে। সে হয়তো রহস্যময়ী হতে চাচ্ছে।

হু-সি কে তার কাজের জায়গায় নামিয়ে দিলাম। একতলা একটা বাড়ি, নাম হংকং পার্লার। বাড়ির বারান্দায় প্লাস্টিকের চেয়ারে এক নাকচ্যাপ্টা বসে আছে। নাকচ্যাপ্টা জাতের বয়স বোঝা মুশকিল, তবে এর বয়স যে ষাটের কাছাকাছি এটা বোঝা যাচ্ছে। গলার চামড়া ঝুলে গেছে। চোখ হলুদ এবং জ্যোতিহীন। বুড়ো নাকচ্যাপ্টা সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বুড়োর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম। মুখ হাসি হাসি করলাম। বুড়োর দৃষ্টি তাতে নরম হলো না। হু-সি'কেও দেখলাম ঘাবড়ে গেছে। সে গলা নামিয়ে বলল, আপনি এই গাড়ি নিয়েই চলে যান।

আমি বললাম, গাড়িভাড়া দেব কীভাবে? আমার পাঞ্জাবির পকেটই নেই। টাকা তো অনেক দূরের ব্যাপার।

মিটারে নব্বই টাকা উঠেছে। হুসি টেক্সিওয়ালার হাতে তিনটা একশ' টাকার নোট দিয়ে বলল, আপনি ইনাকে নিয়ে যান। ইনি যেখানে যেতে চান নিয়ে যাবেন।

আমি বললাম, হু-সি, বারান্দায় পেঁচামুখো যে বুড়ো বসে আছে সে কে?

হু-সি বলল, আমার বস। আমি কাউকে কিছু না বলে গিয়েছিলাম। মনে হয় উনি রাগ করেছেন।

তোমাকে মারবে নাকি?

হু-সি কিছু না বলে চিন্তিত মুখে পার্লারের দিকে রওনা হলো। পেঁচামুখো এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দৃষ্টি হু-সি'র দিকে। বুড়ো মেয়েটাকে সত্যি সত্যি মারবে না-কি। দৃশ্যটা দেখে যাবার ইচ্ছা ছিল। ক্যাবওয়ালা সমানে হর্ন দিচ্ছে। আমাকে ক্যাবে উঠতে হলো।

আমার জন্যে একটি রোমহর্ষক দৃশ্য অপেক্ষা করছিল। দৃশ্যটা হংকং পার্লারের বারান্দায় ঘটল না। দৃশ্যটা মেসে আমার ঘরে। বাংলা ছবির অতি রোমহর্ষক দৃশ্য। যে দৃশ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনশন মিউজিক দিতে হয়। দৃশ্যটা এরকম—

রক্তে মোটামুটি মাখামাখি হয়ে খালি গায়ে শুধু লুঙ্গি পরা এক লোক কুণ্ডুলি পাকিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে আছে। তার একটা চোখ বন্ধ। ফুলে ঢোল হয়ে ঝুলে পড়েছে। একটা হাত বিছানা থেকে বের হয়ে ঝুলছে। হাতের আঙুল থেতলানো, সেখান থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে। মেসের ম্যানেজার দরজার কাছে ভীতমুখে দাঁড়িয়ে।

আমি বললাম, কে?

বিছানায় পড়ে থাকা চরিত্রটি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, হিমু, এসেছ? আমি তোমার বড় খালু।

আপনার একী অবস্থা!

আমাকে মেরেই মনে হয় ফেলত। কোনো রকমে জানে বেঁচেছি। টাকা পয়সা ঘড়ি চশমা সব নিয়ে নিয়েছে। কাপড় চোপড়ও নিয়ে গিয়েছে। নেংটো করে রাস্তার পাশে ফেলে রেখেছিল।

লুঙ্গি পেয়েছেন কোথায়?

এক রিকশাওয়ালা দিয়েছে। সে-ই তোমার এখানে নিয়ে এসেছে। নিজের ফ্ল্যাটে কোন অবস্থায় যাব! হিমু, আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করো। একটা চোখ মনে হয় গেছে। তোমার বড়খালা যেন না জানে। পত্রিকায় নিউজ হবে কি-না কে জানে। একজন দেখলাম ছবি তুলছে। নিউজ হলে আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না। হিমু, পত্রিকার লোকদের সঙ্গে তোমার জানাশোনা আছে?

না।

র‍্যাবের কারোর সঙ্গে পরিচয় আছে?

কেন বলুন তো?

হারামজাদি মেয়েটাকে র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ার করাতে হবে। যেভাবেই হোক এই কাজটা করাতে হবে। র‍্যাব ছাড়া ঐ মেয়েকে কেউ শায়েস্তা করতে পারবে না। পুলিশ কিছু করবে না। শুধু টাকা খাবে। হিমু, তোমার কোনো বন্ধু বান্ধব আছে যাদের আত্মীয়স্বজন র‍্যাবে আছেন ?

অস্থির হবেন না খালু সাহেব। আসুন আগে আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

হিমু, একটা চোখ মনে হয় গেছে। একটা চোখে কিছুই দেখছি না।

খালু সাহেবকে মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেলাম। তাঁর ডান হাত এবং বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ভেঙেছে। স্কাল ফ্রেকচার হয়েছে। ঠোঁট, থুতনি এবং চোখের ভুরু কেটেছে। নিচের পাটির একটা দাঁত ভেঙেছে।

এক্স-রে, সেলাই, ব্যান্ডেজ শেষ হতে হতে রাত দশটা বেজে গেল। ডাক্তাররা খালু সাহেবকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নিলেন। তাঁকে সপ্তাহখানেক হাসপাতালে থাকতে হবে। মেসের ম্যানেজার করিতকর্মা লোক। হাসপাতালের কাকে কাকে যেন টাকা খাইয়ে একটা কেবিনেরও ব্যবস্থা করে ফেলল।

টাকা খাওয়া-খাওয়ির ব্যবস্থা থাকার এটাই সুবিধা। হাসপাতালের কেবিন যে-কোনো সময় পাওয়া যায়। সমস্যা হয় রমজান মাসে। সব ঘুসখোররা রমজান মাসে রোজা রাখেন, তারাবির নামাজ পড়েন। একটা মাস ঘুস খান না। ঘুস খাওয়া শুরু হয় ঈদের জামাতের পর।

খালু সাহেবের কাছ থেকে ঘটনার সারমর্ম যা শুনলাম তা এইরকম— উনি ফ্লাওয়ারের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য রওনা হলেন। অফিসের গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মনে হলো, গাড়ি নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তিনি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিলেন। পথে যাদবপুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার দেখে মনে হলো, খালি হাতে যাওয়া ঠিক হবে না। তিনি এক কেজি রসমালাই এবং এক কেজি মিষ্টি দৈ কিনলেন।

ঠিকানামতো পৌঁছে দেখেন ঠিকানা ভুল। এই ঠিকানায় একটা দর্জির দোকান। তিনি কী করবেন ভাবছেন এমন সময় দেখেন ফ্লাওয়ার আসছে। তাঁকে দেখে খুবই খুশি। সে তাঁর হাত থেকে মিষ্টির প্যাকেট দু'টা নিল। তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। খুবই ঘোরপ্যাঁচের পথ। একসময় সে তাকে এক চিপাগলিতে নিয়ে বলল, দাঁড়ান আমি আসতেছি। বলেই আরেকটা গলিতে ঢুকে গেল। তিনি অপেক্ষা করছেন। এমন সময় ষণ্ডামার্কা দুই ছেলে এসে কথা নাই

বার্তা নাই শুরু করল— কিল, ঘুসি, লাথি। ঘড়ি, টাকা-পয়সা সব নিয়ে নিল। তাঁকে চেপে ধরল নর্দমার উপর। নর্দমার পাকা ওয়ালে তারা তাঁর মাথা ঠুকে আর বলে— মেয়েছেলের সন্ধানে আসছস ? ঐ বুড়া, মেয়েছেলে চাস ?

খালু গল্প শেষ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন— বুঝলে হিমু, এই হলো ঘটনা। দেশ কোথায় গিয়েছে দেখ! আমাকে মেরে ফেলছে। লোকজন যাওয়া আসা করছে, কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না।

ফ্লাওয়ারের কোনো দেখা পেলেন না ? মিষ্টি নিয়ে সে উধাও ?

হুঁ। ফ্লাওয়ারের কথা বাদ দাও। এখন তোমার বড়খালার হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার কী ব্যবস্থা করবে বলো।

এক্ষুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি, আপনি শান্ত হোন।

আমি খালাকে টেলিফোন করলাম। করুণ গলায় বললাম, বড়খালা একটা দুঃসংবাদ আছে।

খালা চিন্তিত গলায় বললেন, কী দুঃসংবাদ ?

খালু সাহেব হাসপাতালে। হাত-পা ভেঙে একাকার। অ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন। উনি দৈ মিষ্টি নিয়ে রওনা হয়েছেন ফ্লাওয়ারের বাড়িতে, এমন সময় পেছন থেকে ট্রাক এসে দিয়েছে ধাক্কা।

খালা বললেন, ভালো করেছে।

আমি বললাম, আমারও ধারণা ভালো করেছে। যাই হোক, খালু সাহেব দৈ মিষ্টি নিয়ে উল্টে পড়লেন। হাত-পা ভাঙলেন। সিরিয়াস জখম। তাঁর আর ফ্লাওয়ারের বাড়িতে যাওয়া হলো না।

খালা বললেন, এটাকে তুই দুঃসংবাদ বলছিস ? আমি এমন আনন্দের খবর অনেক দিন পাই নি।

আমি বললাম, খালু সাহেবকে এসে দেখে যাও। কেবিন নাম্বার সতেরো। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ।

খালা বললেন, আমি যাব দেখতে! পাগল হয়েছিস ? হাসপাতালে থেকে প্রেমের রস কমুক, তারপর দেখা যাবে।

আমি বললাম, খালু সাহেব চিচি করে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। এর কী করবে ?

খালা বললেন, সে লেংচাতে লেংচাতে এসে আমার পায়ে ধরবে। তারপর ক্ষমা।

আমি বললাম, তাহলে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। ডাক্তাররা বলেছেন, কয়েক জায়গায় ভেঙেছে। মিনিমাম এক সপ্তাহ থাকতে হবে।

থাকুক এক সপ্তাহ, শিক্ষা হোক।

টেলিফোন শেষ করে খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, অল কোয়ায়েট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। আপনাকে একবার শুধু পায়ে ধরলেই হবে।

খালু সাহেব বললেন, একবার কেন, দশবার ধরব। হিমু শোন, একটা উপদেশ—স্ত্রী ছাড়া কোনো মেয়েকে বিশ্বাস করবে না। সব মেয়েই কালনাগিনী, পিশাচিনী।

আমার ঘর আলো করে কে যেন বসে আছে। দরজার কাছে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। চৌদ্দ পনেরো বছরের একটা ছেলে। চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার সামনে হলুদ গোলাপ ফুলের তোড়া। আমি মানতে বাধ্য হলাম, হলুদ গোলাপগুলিকে ছেলেটির কাছে ম্লান লাগছে। আমি মুগ্ধ গলায় বললাম, তুমি কে?

ছেলেটি থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমাকে দেখল, তারপর হাসিমুখে লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, বাবা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

কেন বলো তো?

বাবার হয়ে আমি যেন আপনার কাছে ক্ষমা চাই, এইজন্যে পাঠিয়েছেন। আমার বাবার নাম সফিক। তিনি সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে আছেন। তিনি সেরে উঠেছেন। ডাক্তাররা তাকে আরো কিছুদিন অবজারভেশনে রাখবেন।

তুমি বসো।

ছেলেটি বসতে বসতে বলল, চাচা, আপনি কি বাবাকে ক্ষমা করেছেন? কারণ তাকে টেলিফোন করে জানাতে হবে।

আমি বললাম, ক্ষমা চাইবার মতো এমন কিছু তোমার বাবা আমার সঙ্গে করেন নি। তাছাড়া যে বাবার এত চমৎকার একটা ছেলে আছে তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। তুমি কী করো?

আমি আমেরিকার জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটিতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে এবছর ঢুকেছি।

তুমি ছাত্র কেমন?

ভালো। আমার এখনই ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার কথা না। রেজাল্ট খুব ভালো বলে আগেভাগে ঢুকে পড়েছি।

সব A ?

ছেলেটি লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, একটা A, বাকি সব A+।

বড় হয়ে কী হতে চাও ?

আমার মাইক্রোবায়োলজি পড়ার ইচ্ছা, কিন্তু মা চান আমি যেন ডাক্তার হই।

আমি বললাম, তোমার ডাক্তার হওয়াই ভালো। তোমাকে দেখলেই রোগীর রোগ অর্ধেক সেরে যাবে।

চাচা, আপনি অবিকল আমার মা'র মতো কথা বললেন। আপনি কিন্তু এখনো আমার নাম জানতে চান নি।

নাম বলো।

আমার নাম শুভ্র। মা নাম রেখেছেন। মা ছোটবেলায় একটা উপন্যাস পড়েছিলেন— উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নাম শুভ্র। তিনি শুভ্র'র নামে আমার নাম রাখলেন।

উপন্যাসের শুভ্র কেমন বলো তো ?

সে পৃথিবীর শুদ্ধতম মানুষ।

তুমি কি শুদ্ধতম মানুষ হতে চাও ?

না। তবে আমার মা চায়। মা'র অবশ্যি এমনিতেই ধারণা আমি শুদ্ধ।

তুমি কি শুদ্ধ না ?

মা যেরকম ভাবে সেরকম না। আমার এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে আমি এক ক্যান বিয়ার খেয়েছিলাম।

শুভ্র, এখন তুমি কী খাবে বলো।

আপনি যা খেতে বলবেন আমি তাই খাব। আমি আজ সারাদিন আপনার সঙ্গে থাকব। অবশ্যি আপনি যদি অনুমতি দেন।

আমার সঙ্গে থাকতে চাচ্ছ কেন ?

বাবা বলে দিয়েছেন। আজ রাত ন'টার সময় আমি আমেরিকা চলে যাব। আমার সব ব্যাগ গোছানো। গাড়িতে রাখা আছে। সারাদিন আপনার সঙ্গে ঘুরে সন্ধ্যাবেলা এয়ারপোর্টে চলে যাব।

ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই। দুপুরে কী খেতে চাও বলো। তোমার মা নিশ্চয়ই বাবাকে নিয়েই মহাব্যস্ত ছিলেন। তোমাকে রান্নাবান্না করে কিছু খাওয়াতে পারেন নি। বলো দেশ ছেড়ে যাবার আগে আগে কী কী খেতে ইচ্ছা করছে ?

শুভ্র খুবই সহজ ভঙ্গিতে বলল, মটরশুটি আর ফুলকপি দিয়ে বড় কই মাছ।

আর ?

চিতল মাছের কোপ্তা।

আর ?

সীমের বিচি দিয়ে মাগুর মাছের ঝোল। আর কিছু না।

তোমার মা এইসব তোমাকে রান্না করে খাওয়াতেন ?

জি।

চল যাই বাজারে। বাজার করব। নিজের হাতে দেখে শুনে বাজার করা ভালো।

চাচা, রান্না করবে কে ?

আমার রান্নার স্পেশাল লোক আছে। কোনো ছেলের মুখেই মায়ের রান্নার চেয়ে অন্য কারো রান্না ভালো লাগে না। তোমাকে যে মহিলার রান্না খাওয়াব সে তোমার মা'কে ডিস্টিংশন দিয়েও দিতে পারে।

আপনি যখন বলছেন তখন অবশ্যই ডিস্টিংশন দেবেন।

আমি বললেই হবে কেন ?

কারণ আপনি সেইন্ট টাইপ মানুষ।

তোমার বাবা তোমাকে বলে দিয়েছেন ?

জি। বাবা যখন কোমায় ছিলেন তখন প্রায়ই আপনাকে দেখতেন। আপনার গায়ে হলুদ পাঞ্জাবি। আপনি বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাবা সেই হাত ধরতে চেষ্টা করছেন। পারছেন না। যেদিন হাতটা ধরতে পারলেন সেদিনই বাবা কোমা থেকে বের হয়ে এলেন।

আমি বললাম, শুভ্র! তোমার বাবার স্বপ্নের সাধারণ ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাটা মন দিয়ে শোন।

শুভ্র বলল, আমি মন দিয়েই শুনব।

আমি বললাম, তোমার বাবা মাথায় আঘাত পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমার দিকেই তাকিয়েছিলেন। তাঁর কোমায় চলে যাবার মুহূর্তের স্মৃতি হচ্ছে— আমার স্মৃতি। হলুদ পাঞ্জাবি পরা একজন মানুষ। তোমার বাবার ব্রেইন এই স্মৃতি নিয়েই কাজ করেছে। বুঝেছ ?

শুভ্র বলল, চাচা, যুক্তি কি শেষ কথা ?

কাউকে মা ডাকা বা বাবা ডাকা আমার স্বভাবের মধ্যে নেই। এই প্রথম নিয়মের ব্যতিক্রম করে শুভ্র'র কাঁধে হাত রেখে বললাম, নারে বাবা, যুক্তি শেষ কথা না। যুক্তি হলো শুরুর কথা।

আমরা বসে আছি গাড্ডু পীর খসরুর চালায়। এমন হতদরিদ্র পরিবেশে বসে থাকতে শুভ্র'র কোনোরকম অস্বস্তি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। সে চোখ বড় বড় করে সবকিছু দেখছে। তার বিস্ময়ের আয়োজন যথেষ্টই আছে। বজলু কানে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ খসরু ছেলের উপর ইনজাংশান জারি করেছে।

হিমু ভাই বাড়িতে এলেই বজলুকে কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। প্রথমবারে কফির টাকা চেয়ে সে যে অপরাধ করেছে তার শাস্তি এখনো চলছে। আরো চলবে।

বজলু শাস্তি পেয়ে দুঃখিত না। লজ্জিতও না। তার মুখ হাসি হাসি। আজও সে প্রথমদিনের সাইজে বড় প্যান্টটা পরেছে। প্যান্ট বারবার পিছলে যাচ্ছে। তাকে কান ছেড়ে প্যান্ট ধরতে হচ্ছে।

আমি বজলুর দিকে তাকিয়ে বললাম, কিরে ব্যাটা, স্কুলে ভর্তি হয়েছিস ?

বজলু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। রান্নাঘর থেকে জরিনা বলল, ভাইজান, ইসকুলে নিয়মিত যাওয়া আসা করে। নিয়ম কইরা পড়ে। মাস্টার সাব বলছে, হে লেহাপড়ায় ভালো।

গাড্ডু পীরের মেজাজ খারাপ। ভয়ঙ্কর খারাপ। তার মেজাজ খারাপের কারণ বাড়িতে মেহমান এসেছে— বাজার করে নিয়ে এসেছে। সেই বাজারে রান্না হচ্ছে।

গাড্ডু বলল, ভাইজান, আপনে আমারে এত বড় শাস্তি দিলেন ? গরিব হইছি বইল্যা বাজার কইরা আনবেন ? আমার ইচ্ছা করতাছে লাফ দিয়া টেরাকের সামনে পইড়া যাই। ভালোমন্দ দুইটা আমি খাওয়াইতে পারব না ? প্রয়োজনে আমি ডাকাতি করব।

শুভ্র হেসে ফেলল। গাড্ডু পীর বলল, বাবা, হাস কেন ?

শুভ্র বলল, আপনার কথা শুনে হাসি। আপনি সুন্দর করে কথা বলেন।

সুন্দর কথার ভাত নাই বাবা। ভাত আছে কর্মে। আইজ যে আমি টেরাকের নিচে পড়তে চাইতেছি, অনেক দুঃখে পড়তে চাইতেছি।

শুভ্র বলল, ট্রাকের নিচে পড়লে আপনার লাভ কী ? আপনি তো মরেই যাবেন।

বাবাগো, আমার জন্য মরণই ভালো। হিমু ভাই বাজার কইরা আনছে। সেই বাজারে পাক হইতেছে। এরচে' মরণ ভালো না ?

খেতে বসেই শুভ্র আমার দিকে তাকিয়ে বলল, চাচা, আপনার কথা ঠিক। উনার রান্না অসম্ভব ভালো। মা'র রান্নার চেয়ে অবশ্যই ভালো।

জরিনা বলল, বাবাগো, পেট ভইরা খান। গরীবের বাড়ির এই সুবিধা। খাইদ্য থাকে না, মুখে রুচি থাকে। আইজের অবস্থা ভিন্ন। আইজ খাইদ্যও আছে।

শুভ্র বলল, আপনি এত ভালো রান্না কোথায় শিখেছেন ?

গুলশানের এক বড় লোকের বাড়িতে কাজ করতাম। বাবুর্চির এসিসটেন্ট ছিলাম। কুটাবাছা করতাম। বাবুর্চিরে দেইখা দেইখা শিখছি। বাবুর্চির নাম আউয়াল মিয়া।

গাড্ডু পীর বলল, আরো কিছুদিন থাকলে আরো ভালো পাক শিখত, কিন্তু বাড়ির সাব জরিনারে কু-দৃষ্টি দিল। জরিনা চাকরি ছাইড়া চইলা আসল।

শুভ্র বলল, কু-দৃষ্টি কী ?

গাড্ডু পীর বলল, কু-দৃষ্টি কী তুমি বুঝবা না। সব কিছু বুঝা ঠিকও না। এই দুনিয়ার নিয়ম যে যত কম বুঝে সে তত ভালো আছে। বেশি বুঝলেই ধরা।

শুভ্র বলল, বেশি বুঝা খারাপ হবে কেন ? বেশি বুঝার জন্যেই তো সবাই পড়াশোনা করে।

গাড্ডু বলল, এইজন্যে ধরাও খায়। আমার ছেলেও এখন লেখাপড়া শুরু করছে। সেও বিরাট ধরা খাইব।

শুভ্র হাসছে। জরিনা শুভ্র'র দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বলল, আহারে কী সুন্দর কইরা না হাসে! কী সুন্দর!

গাড্ডুপীর বলল, তুমি দেখি পুলাটারে নজর না লাগাইয়া ছাড়বা না। বুকে থুক দেও।

জরিনা বুকে থুক দিল।

জরিনার জন্যে আরেকটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। শুভ্র যে গাড়িতে করে এসেছে সেই গাড়ি জরিনা আগে দেখে নি। অতিথি বিদায় করতে এসে দেখল।

কচি কলাপাতা রঙের হালকা সবুজ গাড়ি। জরিনার মুখ হা হয়ে গেল। সে আমাকে সামান্য আড়ালে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, ভাইজান, আমি বজলুরে নিয়া খোয়াবে যে কচুয়া গাড়িটা দেখছিলাম— এই সেই গাড়ি। কোনো বেশ কম নাই।

শুভ্র বলল, চাচা, আমি কি এদের জন্যে আমেরিকা থেকে গিফট পাঠাতে পারি ?

আমি বললাম, অবশ্যই পার।

কী গিফট পেলে এরা খুশি হবে ?

বজলুর দরকার বেল্ট। ওর দু'টা প্যান্টেরই বহর অনেক বড়।

শুভ্র হাসছে।

আহা, কী নির্মল হাসি! ঢাকার নীল আকাশে আজ ঝলমলে রোদ।

মাজেদা খালার সঙ্গে খালু সাহেবের সম্পর্ক ঠিকঠাক হয়ে গেছে। খালা হাসপাতালে এসে খালু সাহেবকে দেখে গেছেন। পা ধরাধরি পর্ব শেষ হয়েছে। মাজেদা খালা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছেন, দিলাম মাফ করে!

আমি বললাম, এত সহজে মাফ পেয়ে গেল ?

খালা বললেন, ভুল তো আমার। পুরুষ মানুষকে চোখে চোখে রাখতে হয়। চোখের আড়াল হলেই এরা অন্য জিনিস। এরা হলো দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখার বস্তু। দড়ি যতদূর ছাড়া হবে ততদূর পর্যন্ত এরা চরে বেড়াবে। এর বাইরে যাবে না।

খালু সাহেব তাঁর স্ত্রীর মহানুভবতায় মুগ্ধ এবং বিস্মিত। তিনি আমাকে বলেছেন, তোমার খালা মহীয়সী নারী। রান্নাবান্নার লাইনে না থেকে শিক্ষার লাইনে থাকলে বেগম রোকেয়া টাইপ কিছু হয়ে যেত। হিমু, তুমি কি আমার সঙ্গে একমত ? তোমার কি মনে হয় না ঘরে ঘরে এই মহিলার বাঁধানো ছবি থাকা দরকার ?

খালু সাহেবের ঘা শুকাতে শুরু করেছে। দু'একদিনের মধ্যে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন এরকম শোনা যাচ্ছে। তবে তিনি আরো কিছুদিন থাকতে চান। তাঁর ধারণা এখানে যেরকম রেস্ট হচ্ছে বাসায় গেলে তা হবে না। হাসপাতালে স্বাধীন চিন্তার যে সুযোগ সেটা নাকি বাসায় নেই। তাঁর স্বাধীন চিন্তার সবটাই অপরাধীদের শাস্তিবিষয়ক। তিনি সমাজ থেকে অপরাধ সম্পূর্ণ দূর করার পক্ষপাতি। খালু সাহেব স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তার কয়েকটি এরকম—

১

ক্রসফায়ার বাংলাদেশের জন্য মহৌষধ। যারা ক্রসফায়ারের বিপক্ষে কথা বলে তাদেরকেও ক্রসফায়ারের আওতায় আনা উচিত।

২

দেশ পরিচালনার দায়িত্ব র‍্যাবের হাতে দিতে হবে। এই দেশ রাজনীতির উপযুক্ত না। কোনো রাজনীতি এদেশে থাকবে না। যে নেতাই 'প্রিয় ভায়েরা আমার' বলে মুখ খুলবেন তাদেরকেই র‍্যাব ভাইদের হাতে তুলে দেয়া হবে। র‍্যাব তাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

৩

একটি বিশেষ দিনে বাংলাদেশে 'র‍্যাব দিবস' পালিত হবে। সেদিন সবাই কালো পোশাক পরবে। আর্ট কলেজ থেকে একটা র‍্যালি বের হবে। প্রেস ক্লাবে থামবে। সবার হাতে থাকবে নানান ধরনের অস্ত্রের মডেল।

৪

র‍্যাব সঙ্গীত বলে সঙ্গীত থাকবে। ক্রসফায়ারের যে-কোনো খবর রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারের পর পর র‍্যাব সঙ্গীত বাজানো হবে। সঙ্গীতের কথা এরকম হতে পারে—

আমার কৃষ্ণ র‍্যাব
আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার অস্ত্র তোমার বুলেট
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

৫

র‍্যাব ভাইদের জন্যে একটি দৈনিক পত্রিকা থাকবে। কালো নিউজ প্রিন্টের উপর লাল লেখা। পত্রিকার নাম হতে পারে 'দৈনিক র‍্যাব'।

৬

আদালত অবমাননা আইনের মতো র‍্যাব অবমাননা আইন বলে একটি আইন জাতীয় পরিষদে পাশ করতে হবে। এই আইনে র‍্যাবের সমালোচনা করে কেউ কিছু বললেই তার সাজা হয়ে যাবে।

মানুষের নানা ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে। খলু সাহেবের আশা-আকাঙ্ক্ষা এখন এক বিন্দুতে স্থির হয়ে আছে— ফ্লাওয়ারকে এবং তার দুই

সঙ্গীকে র‍্যাবের মাধ্যমে ক্রসফায়ারে ফেলে দেয়া। তিনি ইংরেজিতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও লিখেছেন। প্রবন্ধের শিরোনাম 'পচে যাওয়া সমাজের প্রতি র‍্যাবের দায়িত্ব'। কোনো পত্রিকা প্রবন্ধ ছাপে নি। তবে সাপ্তাহিক পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে তাঁর একটি চিঠি ছাপা হয়েছে।

চিঠিটা এরকম—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী

দেশের আজ একী অবস্থা। ঘোর অমানিশা। ভাসমান পতিতাদের হাতে নগরীর প্রধান প্রধান বিনোদন উদ্যান। যেমন চন্দ্রিমা উদ্যান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। এইসব ভাসমান পতিতারা যুব সমাজকে বিপথে নিচ্ছে। তাদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে ভদ্র নাগরিক। তাদের ছলাকলায় সর্বস্ব হারিয়ে অনেকে পথের ফকির হচ্ছে।

নগরকে পংকিল অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্যে আমি র‍্যাব ভাইদের আহ্বান জানাচ্ছি। দুষ্ট লোকের সমালোচনায় আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। যারা মানবাধিকারের বড় বড় কথা বলছেন তাদেরকে সাবধান। যখন নিরীহ মানুষ গুণ্ডাকর্তৃক আক্রান্ত হয়ে কাতর আর্তনাদ করে তখন আপনারা কোথায় থাকেন ? দয়া করে মানবাধিকারের ফাঁকাবুলি আপনারা আওড়াবেন না। আপনাদের প্রতি আবেদন, আপনারাও সমস্বরে র‍্যাব ভাইদের সমর্থন করে তাদের হাত জোরদার করুন।

কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের এই বাণী র‍্যাবের সাহসী ভাইদের জন্যে প্রয়োজন। কবি বলেছেন—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় ভাই ওরে ভয় নাই।

ইতি—

গুণ্ডাকর্তৃক নির্যাতিত একজন
সাধারণ নাগরিক

মার খেয়ে তক্তা হয়ে যাবার পর খলু সাহেব র‍্যাবের অন্ধ ভক্ত হয়েছেন। তাঁর মাজেদা খালা হু-সি'র অখাদ্য রান্না খেয়ে হয়েছেন হু-সি ভক্ত। তিনি কোমর বেঁধে লেগেছেন হু-সি'র যেন একটা গতি হয়। বিয়ে করে সে যেন তাঁর

চোখের সামনে সংসার করে। গতকাল সন্ধ্যার কথা। খালা টেলিফোন করে বললেন, হিমু, গুড নিউজ। হু-সি ইয়েস বলে দিয়েছে। সরাসরি ইয়েস না। একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে।

আমি বললাম, কোন বিষয়ে ইয়েস?

তোকে বিয়ের বিষয়ে। কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলো।

আমি বললাম, সে তো বাংলাই জানে না। টেলিফোনে বিয়ের মতো জটিল বিষয়ে কী কথা বলল?

মাজেদা খালা বললেন, বাংলা জানে না বাংলা শিখছে। যে শিখতে পারে সে দ্রুতই শিখতে পারে। তার এখন ধ্যান-জ্ঞান বাংলা শেখা।

সে তোমাকে কী বলল?

সে বলেছে, যেখানে কাজ করছে এই কাজ তার পছন্দ না। সে সব ছেড়ে দিতে চায়।

এক অক্ষর বাংলা জানে না মেয়ে? এত কথা বলে ফেলল?

মাজেদা খালা বললেন, ডিকশনারির সাহায্য নিয়ে নিয়ে ভাঙা ভাঙাভাবে বলেছে।

আর কী কথা হয়েছে?

বিয়ের বিষয়ে জানতে চাইল, বাঙালি ছেলে বিয়ে করতে স্টেটের পারমিশন লাগবে কি-না? আমি বলে দিয়েছি, কিছু লাগবে না। তিনবার কবুল বললেই হবে।

তার ধর্ম কী?

বৌদ্ধ ধর্ম। এটা কোনো ব্যাপারই না। মাওলানা ডাকিয়ে তাকে মুসলমান করব। আমি তার জন্যে একটা নামও ঠিক করেছি। মুসলমান নাম।

কী নাম?

লায়লা। লায়লা মানে হলো রাত। তোর সঙ্গে বিয়ে হবার পর সে তার নাম লিখবে লায়লা হিমু।

খালা, বিয়েটা হবে কবে?

তোরা দুইজনে মিলে ঠিক কর কবে। তোর বিয়ের যাবতীয় খরচ আমার। তোকে পকেট থেকে একটা পয়সা বের করতে হবে না।

আমার পকেটই নেই। পকেট থেকে কী বের করব?

লায়লাকে এক সেট গয়না দেব আর তোকে একটা স্যুট বানিয়ে দেব।

স্যুট গায়ে খালি পায়ে ঘুরব, এটা কি ঠিক হবে?

খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি বন্ধ। অনেক হেঁটেছিস। আর না। হিমু শোন, ও তোকে একদিন রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে চায়। ঐদিন তার রান্না তুই খেতে পারিস নি— এই নিয়ে বেচারা খুবই মনোকষ্টে আছে। তোর যে একটা গতি হচ্ছে আমি এতেই খুশি। আমি দর্জি পাঠিয়ে দেব, তুই স্যুটের মাপ দিয়ে দিবি। ঠিক আছে?

হুঁ।

তোকে নিয়ে একদিন নিউমার্কেটে যাব। বিয়ের কার্ড বাছব।

বিয়ের কার্ডও থাকবে?

অবশ্যই থাকবে। তোর জন্যে কার্ডের দরকার নেই। মেয়েটার জন্যে দরকার। বিদেশী মেয়ে, আত্মীয়স্বজন ছাড়া একা একা বিয়ে করছে। আহারে! এখন কি তুই ফ্রি?

কেন?

ফ্রি থাকলে নিউমার্কেটে চলে আয়। আজই কার্ড কিনে ফেলি।

আজই কিনতে হবে?

হ্যাঁ, আজই কিনতে হবে। তোর খালুর পরিচিত এক প্রেস আছে, দেখি প্রেস থেকে বিনা পয়সায় কার্ড ছাপানো যায় কিনা। তোর কার্ড কয়টা লাগবে বল তো?

আমার মাজেদা খালার মতো মানুষের জন্যেই হয়তোবা কোরান শরীফে আল্লাহপাক বলেছেন— 'হে মানব সম্প্রদায়, তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।'

মাজেদা খালা তিনশ' কার্ড ছাপিয়ে ফেলেছেন। কার্ডে বিয়ের তারিখের জায়গাটা খালি। তারিখ ঠিক হবার পর হাতে লিখে দেয়া হবে। কনের নামের জায়গায় লেখা— মুসলমান নাম লায়লা। চৈনিক নাম হু-সি। কার্ডও বেশ বাহারি। বিশাল এক গোলাপ ফুটে আছে। গোলাপের উপর প্রজাপতি বসে আছে। প্রজাপতির পাখায় লেখা— শুভ বিবাহ।

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, কার্ড ছাপিয়ে ফেলেছ?

মাজেদা খালা বললেন, হুঁ। অসুবিধা কী? কাজ এগিয়ে থাকল। তোর কয়টা কার্ড দরকার? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপাতত একশ' কার্ড রেখে যাচ্ছি। আরো লাগলে বলবি।

তুমি যে কার্ড ছাপিয়েছ হু-সি জানে?

অবশ্যই জানে। তাকে দেখিয়েছি। অ্যাই, তুই ঐ মেয়েটার সঙ্গে কবে রেস্টুরেন্টে খেতে যাবি? বিয়ের আগে তোদের মধ্যে ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়া দরকার না?

ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর জন্যে হু-সি'কে নিয়ে একদিন রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম। নতুন এক রেস্টুরেন্ট হয়েছে, নাম 'ভূত'। সেখানে নাকি বয় বাবুর্চি র‍্যাবের পোশাক পরে থাকে। খাওয়া-দাওয়ার মাঝখানে ভূতের নৃত্য হয়। রেস্টুরেন্টের খরচ হিসেবে খালা দুই হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছেন। বিল যেন হু-সি না দেয়। আমি দেই।

দু'জনে এক কোনায় বসেছি। টেবিলে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ক্যান্ডেল লাইট ডিনার। হু-সি'কে দেখে মনে হচ্ছে সে খুবই লজ্জা পাচ্ছে। সে বলল, আমার কাছে সবই স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে। কোনো কিছুই রিয়েল মনে হচ্ছে না। আমার কাছে মনে হচ্ছে সত্যিই আমাদের বিয়ে হচ্ছে।

আমি বললাম, আসলে হচ্ছে না?

জানি না। স্বপ্ন তো আর বাস্তবের মতো না। স্বপ্নে অনেক কিছু হয়ে যায়। এটা তো স্বপ্নই।

স্বপ্ন?

হ্যাঁ, স্বপ্ন এবং আমার জীবনে দেখা সবচে' সুন্দর স্বপ্ন।

হু-সি টেবিল থেকে ন্যাপকিন নিয়ে দুই চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি কার্ড বিলি শুরু করলাম। প্রথম কার্ড দিলাম মেস ম্যানেজার জয়নালকে।

জয়নাল চোখ কপালে তুলে বলল, আপনি বিয়ে করছেন? আপনি? মেয়ের দেশ কোথায়?

মেয়ে চাইনিজ।

কী বলেন এইসব? সে করে কী?

পা টিপাটিপি করে।

আপনার কথা তো কিছুই বুঝতেছি না। বিয়ে কবে?

এখনো ডেট হয় নাই।

আরে ঠিকই তো। কার্ডে তারিখ নাই। কিছুই নাই। ঘটনা তো কিছু বুঝতেছি না হিমু ভাই।

আমি নিজেও বুঝতে পারছি না।

আপনের সব কাজকাম এমন আউলাঝাউলা। বিয়ে করতেছেন সেইটাও আউলা। বিয়ের উকিল কে?

উকিল মোক্তার সবই আমার বড়খালা।

মেয়ে কি সত্যিই চাইনিজ?

একশ' পারসেন্ট খাঁটি চাইনিজ। সাপ খাওয়া চাইনিজ। বিয়েতে খাসির রেজালার পাশাপাশি সাপেরও একটা আইটেম থাকবে। সাপের ঝালফ্রাই। বেশ কিছু চাইনিজ গেস্ট থাকবে তো, তাদের জন্যে।

জয়নালকে স্তম্ভিত অবস্থায় রেখে আমি কার্ডের প্যাকেট নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। কার্ড যখন ছাপা হয়েই গেছে, বিলি করে দেই।

খুঁজে খুঁজে ফ্লাওয়ারের বাড়ি বের করলাম। মাছের আড়তের পেছনের বস্তি। সামনে কাঁঠগোলাপের গাছ। টিনের ছাপড়া। দরজায় কটকটে লাল রঙ।

কড়া নাড়তেই সে বের হয়ে এলো। হাসি হাসি মুখ। পান খাওয়া লাল ঠোঁট। হাতভর্তি লাল-নীল কাচের চুড়ি। আমি কার্ডটা তার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললাম, বিয়ের দাওয়াত দিতে এসেছি।

হতভম্ব ফ্লাওয়ার বলল, কার বিয়া ?

আমার।

আপনে আবার কে ?

আমার নাম হিমু।

আমি তো আফনেরে চিনি না।

আমাকে না চিনলেও আমার খালুকে তুমি চেন। ঐ যে দৈ মিষ্টি নিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোক এসেছিলেন! তুমি দুই গুণ্ডা দিয়ে মেরে তাকে তক্তা বানিয়েছ। মনে পড়েছে ? তোমার দুই গুণ্ডা বন্ধুর জন্যেও দু'টা কার্ড রাখ।

ফ্লাওয়ার হাত বাড়িয়ে বাকি দু'টা কার্ডও নিল।

আমি মধুর ভঙ্গিতে বললাম, এসো কিন্তু!

ফ্লাওয়ার হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সুন্দর বাঙালি মেয়ের মুখ। যামিনী রায় এই মেয়েকে দেখলে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা বঙ্গ ললনার ছবি এঁকে ফেলতেন।

কার্ড দেয়ার লোক পাচ্ছি না। রাজমণি ঈশা খাঁ হোটেলের দারোয়ান ভাইকে একটা দিলাম। সে আনন্দের সঙ্গেই কার্ড নিল। বিড়বিড় করে বলল, ভাইসাহেব, আপনেরে কিন্তু চিনি নাই।

আমি বললাম, ঐ যে এক ছেলে চা-কফি বিক্রি করতে এসেছিল। আপনি তাকে এক চড় লাগালেন। সে ফ্লাস্ক ফেলে দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল।

জি জি মনে পড়েছে।

আসবেন কিন্তু বিয়েতে। আপনি আমার বন্ধু মানুষ।

অবশ্যই যাব।

পুরনো বন্ধুত্বের স্মরণে আমরা দু'জন কফিওয়ালার কাছ থেকে কফি খেলাম। দারোয়ান ভাই দাম দিলেন। আমি কফিওয়ালাকেও একটা কার্ড দিলাম।

এক ভিক্ষুক এই সময় ভিক্ষা চাইতে এসেছিল। তাকে কফি খাইয়ে দিলাম। দাওয়াতের একটা কার্ড দিলাম।

সে বলল, জিনিসটা কী ?

আমি বললাম, দাওয়াতের কার্ড। আমি বিয়ে করছি। আমার বিয়েতে আপনার দাওয়াত।

ফকির বিস্মিত হলো না। এমনভাবে কার্ডটা ঝুলিতে রাখল যেন বিয়ের দাওয়াতের কার্ড পাওয়া তার জন্যে নতুন কিছু না। প্রায়ই পায়।

এখন আমি র‍্যাবের অফিসে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে শুভ্র'র বাবা হামবাবুকে দেখা যাচ্ছে। উনি তাহলে ফিরেছেন। চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই উনি চোখ নামিয়ে নিলেন। আমি তিনজনকে তিনটা বিয়ের কার্ড দিলাম। অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার, বিয়ে করতে যাচ্ছি। মেয়ে চাইনিজ। মেইনল্যান্ড চায়নার হুনান প্রদেশের মেয়ে। পরে হংকং-এ চলে যায়।

তিনজনই গভীর মনোযোগে কার্ড পড়লেন। তিনজনই চুপচাপ। ইন্টারেস্টিং একটা বিয়ের কার্ড হাতে পেয়েও কেউ কিছু বলছে না— এটা বিস্ময়কর।

মধ্যমণি নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, তোমার চেঙ্গিস খান সাহেবকে পাওয়া গেছে। যাবার সময় নিয়ে যেও।

আমি বললাম, স্যার ধন্যবাদ।

আবারো নীরবতা। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে— Silence is golden. নীরবতা হীরন্ময়। প্রবাদটা সত্য বলে মনে হচ্ছে না। নীরবতা মাথার উপর চেপে বসেছে।

মধ্যমণি আবারো নীরবতা ভঙ্গ করলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, তোমার মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে রিডিকিউল করার একটা প্রবণতা লক্ষ করছি। Why ?

আমি বললাম, আপনারা মানুষের জীবন নিয়ে রিডিকিউল করেন, সেই জন্যেই হয়তো।

শুভ্র'র বাবা বললেন, (তিনি আপনি আপনি করে কথা বলছেন) আপনি কেন আমাদের কর্মকাণ্ড সমর্থন করেন না বলুন তো ? আপনার যুক্তিটা শুনি। আপনি কি চান না ভয়ঙ্কর অপরাধীরা শেষ হয়ে যাক ? ক্যান্সার সেলকে ধ্বংস করতেই হয়। ধ্বংস না করলে এই সেল সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

আমি বললাম, স্যার, মানুষ ক্যান্সার সেল না। প্রকৃতি মানুষকে অনেক যত্নে তৈরি করে। একটা ভ্রূণ মায়ের পেটে বড় হয়। তার জন্যে প্রকৃতি কী বিপুল আয়োজনই না করে! তাকে রক্ত পাঠায়, অক্সিজেন পাঠায়। অতি যত্নে তার শরীরের একেকটা জিনিস তৈরি হয়। দুই মাস বয়সে হাড়, তিন মাসে চামড়া, পাঁচ মাস বয়সে ফুসফুস। এত যত্নে তৈরি একটা জিনিস বিনা বিচারে ক্রসফায়ারে মরে যাবে— এটা কি ঠিক?

পিশাচের আবার বিচার কী?

পিশাচেরও বিচার আছে। পিশাচের কথাও আমরা শুনব। সে কেন পিশাচ হয়েছে এটাও দেখব।

শুভ্র'র বাবা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে। আমার ধারণা, সুসংবাদ-দুঃসংবাদ আপনার কাছে কোনো ব্যাপার না। যে মেয়েটার নাম এই কার্ডে লেখা তাকে গতকাল রাত তিনটার সময় আমরা গ্রেফতার করেছি। মেয়েটির সঙ্গে আপনার খালা এবং আপনার ঘনিষ্ঠতার কথাও আমরা জানি। এই কার্ডের বিষয়ও আমাদের জানা। মেয়েটির পেছনে এবং আপনার পেছনে সবসময় লোক লাগানো ছিল। আপনি অতি উদ্ভট একজন মানুষ। এর বাইরে আপনার বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। আপনার বান্ধবী হু-সি অবশ্যি বলেছে আপনি একজন মুঘুমি অর্থাৎ জাদুকর। হয়তোবা আপনি জাদুকর। কিন্তু আপনার বান্ধবী ভয়ঙ্কর অপরাধী।

হু-সি কী করেছে?

আন্তর্জাতিক হিরোইন চক্রের সে কেউকেটা টাইপ একজন। তার সঙ্গে প্রচুর হিরোইন পাওয়া গেছে। হিমু, আপনি কিছু বলবেন? আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন। আমরা আপনার কথা শুনব।

জি বলব।

বলুন।

আপনার ছেলে শুভ্রকে আমি আমার বিয়ের একটা কার্ড পাঠাতে চাচ্ছিলাম। আপনি কি আমার হয়ে কার্ডটা পাঠাবেন?

অবশ্যই। দিন, কার্ড দিন।

আর কিছু বলতে চান?

না।

মধ্যমণি বললেন, তোমাকে একটা খবর দেই। মুরগি ছাদেককে গরম ভাত এবং ডিমের ভর্তা খাওয়ানো হয়েছিল। সে খুব আরাম করেই খেয়েছে।

আমি বললাম, স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। তাকে একটা সিগারেট খাওয়ানোর কথাও ছিল।

ঘামবাবু বললেন, আমি তাকে একটা সিগারেট নিজের হাতে দিয়েছি।

আমি বললাম, পরকালে আপনি সত্তরটা সিগারেট পাবেন। সাড়ে তিন প্যাকেট। আরাম করে খেতে পারবেন। পরকালে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের সমস্যা নেই।

Fo

দ্রুত বিচার আইনে হু-সি'র তিন সহযোগীর প্রত্যেকের ফাঁসির হুকুম হলো। অল্প বয়স এবং মেয়ে হবার কারণে হু-সি'র হলো যাবজ্জীবন।

জেল হাজতে একদিন তাকে দেখতে গেলাম। আশ্চর্য, তার চেহারা কীভাবে জানি বাঙালি মেয়েদের মতো হয়ে গেছে। দেখে মনেই হয় না মেয়েটা বিদেশীনি। গায়ের রঙ সামান্য ময়লা হয়েছে, কিন্তু চোখ আগের মতোই উজ্জ্বল।

আমি বললাম, কেমন আছ হু-সি?

সে মাথা নিচু করে বলল, ভালো আছি।

নিজের দেশের জন্যে মন কাঁদে?

না।

প্রিয়জনদের দেখতে ইচ্ছা করে? বাবা-মা, ভাই-বোন?

না।

কোনো কিছু খেতে ইচ্ছা করে?

না।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকো না। কিছু বলো।

হু-সি মাথা নিচু করে বলল, আপনি প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখ জেলখানায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

জানুয়ারির ৯ তারিখ কেন?

হু-সি চাপা গলায় বলল, ঐ দিনটা আমার জন্যে বিশেষ একটা দিন। ঐ দিন আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আপনি আসবেন তো?

অবশ্যই।

আপনার বড়খালাকে বলবেন যে, আমি তাঁকে মু কিন ডেকেছি। মু কিন হলো মা। আমরা চাইনিজরা কখনো নিজের মা ছাড়া কাউকে মু কিন ডাকি না।

বলব।

হু-সি'র চোখে এক বিন্দু অশ্রু টলমল করছে।

আমি বুঝতে পারছি, সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যেন এই চোখের পানি গড়িয়ে না পড়ে। সে চাইনিজ ভাষায় আমাকে কী যেন বলল। আমি বললাম, কী বললে বুঝতে পারি নি।

সে বলল, আপনার বোঝার দরকার নেই।

হু-সি চোখের পানি আটকে রাখতে পারে নি। অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়েছে গালে। সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল করে উঠেছে হীরের দানার মতো। প্রকৃতি কত বিচিত্রভাবেই না তার সৌন্দর্য ছড়িয়ে রেখেছে!

বাংলাদেশের লেখালেখির ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া....* ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। জাপান টেলিভিশন NHK তাঁকে নিয়ে একটি পনেরো মিনিটের ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে Who is who in Asia শিরোনামে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। একা থাকতে পছন্দ করেন। এখন তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দন কানন 'নুহাশ পল্লীতে'।